শ্রীউমাশংকর সরকার

বলরাম-মন্দিরে

সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

বলরাম-মন্দির
বাগবাজার, কলিকাতা

প্রকাশক :
বলরাম-মন্দিরের ট্রাষ্টীগণের পক্ষে
স্বামী দেবানন্দ
বলরাম-মন্দির
৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৩

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৫

মূল্য—বার আনা
(৭৫ নঃ পঃ)

মুদ্রক :
শ্রীমৃণালকান্তি সেনগুপ্ত
মহাজাতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭, ডাঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা-১২

প্রকাশকের নিবেদন

বলরাম-মন্দির ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বিশিষ্ট লীলাক্ষেত্র। ঠাকুরের ঐ সকল লীলা "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে বলরাম-মন্দিরের সাপ্তাহিক ধর্ম-সভার একটি অধিবেশনে "বলরাম-মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ" এই বিষয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ভক্ত-গণের আগ্রহে ঐ আলোচনার সারাংশ অন্য প্রসঙ্গ সহ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। "উদ্বোধনের" সহকারী সম্পাদক স্বামী জীবানন্দ যত্নপূর্ব্বক এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইহার পাণ্ডুলিপি স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী বোধাত্মানন্দ দেখিয়া দিয়াছেন। স্বামী নির্বাণানন্দ পুস্তকখানির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কাগজবিক্রেতা "এইচ্, কে, ঘোষ এ্যাণ্ড কোং" অনুগ্রহপূর্বক পুস্তকের জন্য কাগজ দান করিয়াছেন এবং "মহাজাতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" অল্প ব্যয়ে উহা ছাপিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি পুস্তকখানি ভক্তবৃন্দের উপযোগী হইবে। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বলরাম-মন্দির ট্রাষ্টের অন্তর্গত শ্রীশ্রীঠাকুরসেবাদি কার্যে ব্যয়িত হইবে। ইতি—

বলরাম-মন্দির
মহালয়া, ১৩৬৫ দেবানন্দ

সূচীপত্র

ভূমিকা

দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারত তথা ভারত-বহির্ভূত প্রদেশে যুগাবতাররূপে পূজিত হইতেছেন। শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান এই লোকোত্তর মহাপুরুষের অধ্যাত্ম জীবন ও তাঁহার ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব্ব বাণী ইহকাল-ভোগসর্ব্বস্ব মানবমনে ধর্মের এক বিপুল বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই উহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া সংশয়াবিষ্ট মানবকে সত্যের অনুসন্ধানে প্রেরণা দিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন—ত্যাগ, সংযম, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্ত থাকিয়া মনুষ্য মাত্রেই অনাবিল আনন্দ ও পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন।

পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীভগবান যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন যুগধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি মনুষ্যরূপে যে সকল লীলা করেন তাহা নিত্য, এবং তাঁহার স্থূলদেহ অন্তর্ধানের পরেও তিনি ভাগবতী তনু আশ্রয় করিয়া লীলাস্থলে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। কামগন্ধহীন ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তগণ এই পবিত্র লীলাভূমিতে সেই নিত্যলীলা দর্শন করিয়া তদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবিতায় আছে—

“অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥”

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্যলীলা সম্বন্ধে বলিতেন,—"চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।"

সাধারণ লোক এই অবতার-লীলা আশ্রয় করিয়াই জগৎকারণ ঈশ্বরের নিত্য-লীলা-বিলাস উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন।

"ভগবান লাভ মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য"—এই পরম সত্য শিখাইতে শ্রীভগবান এইবার রামকৃষ্ণ-রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ও উহার উপকণ্ঠে শত শত নরনারীকে তাঁহার প্রেমভক্তির অপূর্ব লীলার মাধুর্যরসে আপ্লুত করিয়া ভগবদ্‌ভাবে বিভোর করিয়া রাখিতেন। ভগবানের এই পবিত্র নিত্য লীলাভূমি চিরকালই ভক্তজনের প্রিয়। তাঁহার লীলার পুণ্য কাহিনী যতই প্রচার হইতেছে, ততই দেশ বিদেশ হইতে শত শত ভক্ত নরনারী আকুল আগ্রহে এই পবিত্র লীলাস্থল দর্শন-মানসে ছুটিয়া আসিতেছেন। কলিকাতাস্থিত বসুভবন—'বলরাম-মন্দির' শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বিশিষ্ট লীলানিকেতন। এই বসু-পরিবারবর্গের সকলেই বংশানুক্রমিক পরম ভক্ত বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে মধ্যে মধ্যে আহার ও রাত্রিযাপন করিতেন। 'বলরাম-মন্দির' জনসাধারণের নিকট এখন আর অজ্ঞাত নহে। ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইহা এখন শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপ হইয়াছে। শ্রীভগবান ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত এই লীলাভূমি যাহাতে সর্বকালে সকলের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ দান করিতে পারে, তজ্জন্য পরম ভক্ত শ্রীবলরাম বসু

মহোদয়ের সুযোগ্য সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ বসু মহাশয় পৃথক্‌ভাবে একটি 'ট্রাষ্ট্‌ ডিড্‌' করিয়া তাঁহার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা উহাতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সদভিপ্রায় অনুসারে উক্ত ট্রাষ্টীগণ 'বলরাম-মন্দিরে' নিয়মিতভাবে ধর্মসভা, শাস্ত্রাদিপাঠ ও ভজনকীর্তনাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শত শত ভক্ত জনসাধারণ এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিপুল আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুর লীলামুখরিত বলরাম-মন্দিরের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। আশা করি ইহা পাঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলামৃত আস্বাদন করিয়া ভক্তজনের অন্তর দিব্য ভাবভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

বেলুড় মঠ — স্বামী নির্বাণানন্দ

মহালয়া, ১৩৬৫
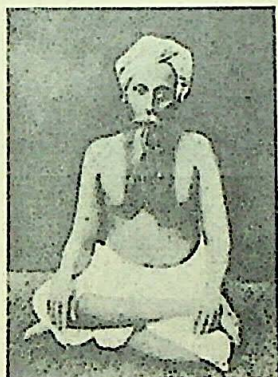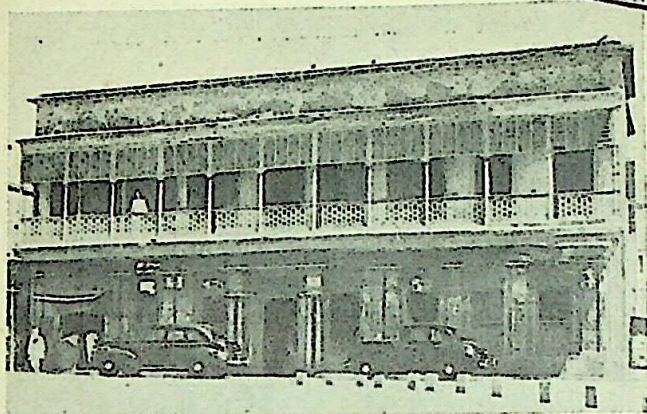
বলরাম-মন্দির

ভক্ত বলরাম বসু
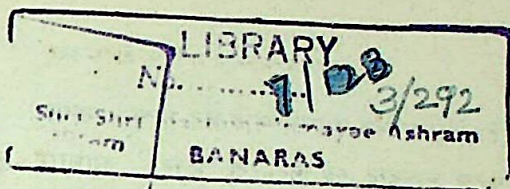
বলরাম-মন্দির

ধন্য 'বলরাম-মন্দির'! তোমাকে বার বার প্রণাম করি। 'বলরাম-মন্দির' কথাটি উচ্চারণ-মাত্রই হৃদয় পবিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। যে স্থানে অবতার-পুরুষের শ্রীচরণ একবার মাত্র স্থাপিত হয় সেই স্থানই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়, আর এই বলরাম-মন্দিরে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুই একবার নয়, প্রায় শতাধিক বার আগমন করিয়া পুণ্য পদরেণুদানে ও অপূর্ব ভগবৎপ্রসঙ্গে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চার করিয়াছিলেন, শত শত ভক্ত এখানে তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ ও অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন—এই স্থান যে মহাতীর্থ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই মহাতীর্থে কত জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত ভক্তির প্রস্রবণ প্রবলবেগে উৎসারিত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বলরাম-মন্দিরের আকাশ বাতাস এবং প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে ভাষা মূক ও লেখনী স্তব্ধ হইয়া যায়।

মন্দিরে দেবতা বিরাজ করেন বলিয়াই মন্দিরের মাহাত্ম্য। ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর এই ভবনকে শুধু বাসগৃহ বলিয়া ধারণা করিলে ভুল হইবে—এখানে দেবতার সান্নিধ্য সদা বর্তমান,

তাই ইহা মন্দির আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ এই ভবনকে 'মন্দির' আখ্যায় ভূষিত করিয়া ইহার উপযুক্ত মর্যাদাই দিয়াছেন।

ভক্তির মূর্ত প্রতীক ও ভক্তসেবক বলরাম বসুর হৃদয় ছিল ভগবানের ভিতর বাটীর বৈঠকখানা, সেখানে ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা স্থান পাইত না—আর তাঁহার বহির্গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদগণের প্রসিদ্ধ মিলনক্ষেত্র ও লীলাস্থলে পরিণত হইয়া ভগবানের বাহিরের বৈঠকখানার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

'কথামৃত'-কার পরমশ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্মৃতি-বিজড়িত এই বলরাম-ভবনের পবিত্রতা স্মরণ করিয়া তাঁহার অনবদ্য লেখনীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন: ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাহিলেন। ... এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে। [১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন: দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কখনও কখনও 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন। কলিকাতার বসুপাড়ার এই বাটীকে তাঁহার 'দ্বিতীয় কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ... কাজেই এখানে আসিয়া ঠাকুর যে বিশেষ আনন্দ পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১।১৪।১।২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে বলরাম-ভবন সম্বন্ধে এই মনোরম উক্তি রহিয়াছে :

ভক্তের বাজার ঠিক বসুর ভবন।
শান্তিময় বৃহৎ দ্বিতল নিকেতন॥
ভবনে মহিমা কিবা না যায় বর্ণন।
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস-প্রাঙ্গণ॥
জগন্নাথ-প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে।
ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥
প্রধান বৈঠক হয় আসিয়া শহরে।
মহাভক্ত বলরাম বসুর মন্দিরে॥
পরিপূর্ণ নিকেতন নাহি মিলে বাট।
প্রেমের বেসাত খালি আনন্দের হাট॥

অবতার-পুরুষগণের লীলাস্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে উল্লেখ করা যায় : (১) জন্মস্থান (২) সাধনার স্থান (৩) প্রচারের স্থান (৪) নির্বাণের স্থান।

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া জন্ম বাল্য ও কৈশোরের কত লীলাস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিতেছে। তাঁহার সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বর বিশ্বের মহাতীর্থ ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের লীলাক্ষেত্র। কাশীপুর উদ্যানবাটী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলাক্ষেত্র।

দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সব স্থানে গমন করিয়াছিলেন সেই সব স্থানেই ভক্তবৃন্দ তাঁহার কথামৃত শ্রবণ করিয়াছেন; সেই সকল স্থানকেই তাঁহার অল্পবিস্তর প্রচারের স্থান বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু বলরাম বসুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লইয়াই গমন করিতেন—সে উদ্দেশ্য ছিল ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে যখন অন্যান্য জায়গায় গমন করিতেন তখন সেই সমস্ত স্থানে রাত্রিতে থাকিতেন না বা অন্নগ্রহণ করিতেন না, দক্ষিণেশ্বরেই প্রত্যাবর্তন করিতেন; কিন্তু বলরাম-মন্দিরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত, তিনি এখানে একাধিক বার রাত্রিবাস ও অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবী ত্যাগী ভক্তবৃন্দকে এই বাটীতে বসিয়া আকর্ষণ করিতেন। অন্ত্যলীলার পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাধার এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র এই বাটীতে রাখা হয়। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এখানে বাস করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠ হওয়ার পরেও তাঁহারা যখন কলিকাতা আসিতেন তখন এই বলরাম-মন্দিরেই উঠিতেন এবং আহারাদি করিতেন। বস্তুতঃ বলরাম-ভবন তখন স্বামীজীদিগের আগমনে ও অবস্থানে মঠে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্ববিখ্যাত সেবাপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-সভা এইখানেই হইয়াছিল।

সাধু ও ভক্তগণের ভজন-কীর্তন, ধর্মসঙ্গীত, পূজা-পাঠ, সদালোচনা, সৎপ্রসঙ্গ, সৎকথা প্রভৃতিতে বলরাম-মন্দির তখন সর্বদা

মুখরিত থাকিত। উনবিংশ শতকের শেষভাগের এবং বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকের ধর্মালোচনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র বলরাম-মন্দির আজও বিগত দিনের কত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিয়া উদাসীন পথচারীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *

---

* বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'বলরাম-মন্দির' একটি প্রাচীন ধরনের লাল রঙের বৃহৎ অট্টালিকা। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় হইতে বহির্গত ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ ধরিয়া অল্প দূর পশ্চিমে অগ্রসর হইলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, ইহারই সংলগ্ন রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট ধরিয়া পাঁচ ছয় মিনিট যাইলেই বলরাম-মন্দির পাওয়া যায়; অথবা রাজবল্লভ পাড়ায় বাস হইতে নামিয়া উত্তর দিকের যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ ধরিয়া আসিলে সম্মুখেই দেখা যায় বলরাম-মন্দির। ইহারই অদূরে উত্তর দিকে মহাকবি গিরীশ চন্দ্রের বাটী এবং ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক বিলুপ্ত বোস পাড়া লেন-স্থিত স্বামী তুরীয়ানন্দের জন্মস্থান। বলরাম-মন্দির হইতে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' ১নং উদ্বোধন লেন—উত্তর দিকে মাত্র আট মিনিটের পথ এবং নিবেদিতা স্কুল—পশ্চিমে মাত্র তিন মিনিটের পথ।

ভক্ত বলরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বলরাম বসু ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-মালিকার একটি অত্যুজ্জ্বল মণি। এই মণিপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে: এক সময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা! আর সেই উন্মাদ-তরঙ্গের সকলেরই ভিতর উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদক আকর্ষণ! সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি তাহাদের অন্যতম। বলরামবাবু যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হন, সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন—এ ব্যক্তি সেই লোক।

উপরি-উক্ত ঘটনাটি পুঁথির ভাষায়:

কত অন্তরঙ্গ শুন ভক্ত বলরাম।
প্রভুর শ্রীবাক্যে আছে তাহার প্রমাণ॥

একদিন গঙ্গাকূলে করেন ভাবনা।
নদীয়ায় গৌরচন্দ্র অবতার কি না॥
সত্য যদি অবশ্যই পাব দরশন।
বলেছি অনেক আগে করহ স্মরণ॥
ভাবিতে ভাবিতে হেন পঞ্চবটতলে।
উঠিল কীর্তন-রোল গঙ্গার সলিলে॥
শব্দ ধরি দেখিলেন প্রভুদেব চেয়ে।
উঠে কীর্তনিয়া দল জল তুফালিয়ে॥
পরে দরশনে প্রভু জগৎগোঁসাই।
প্রত্যক্ষে পাইলা দুই গৌর-নিতাই॥
উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে দুই জনে।
মাতোয়ারা সঙ্গে যারা নাচে সংকীর্তনে॥
যত লোক সংকীর্তনে ছিল বিদ্যমান।
তার মধ্যে একজন ভক্ত বলরাম॥
স্বতন্ত্র আধার তাঁর ছিল নদেপুরে।
এইবারে বলরাম প্রভু-অবতারে॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গদিগের অন্যতম বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে যে ভক্তপ্রবরের জন্মান্তর-পরিচিতি সেই শুদ্ধসত্ত্ব বলরামের জন্ম হয় ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ (ডিসেম্বর, ১৮৪২ খৃঃ) এক প্রসিদ্ধ ভক্ত পরিবারে। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সকলেই পুরুষানুক্রমে ঈশ্বরপরায়ণ এবং আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন। বলরামের প্রপিতামহ দেবদ্বিজে ভক্তি-

পরায়ণ স্বনামধন্য কৃষ্ণরাম বসু দুর্ভিক্ষ-নিবারণকল্পে স্বোপার্জিত লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতার কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট আজও তাঁহার স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কৃষ্ণনগরে ১৫টি জলাশয় ও ১০টি শিবালয় প্রতিষ্ঠা, মাহেশ হইতে বল্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথের কাষ্ঠ-নির্মিত রথ—তাঁহার বহুবিধ কীর্তির নিদর্শন। বলরামবাবুর পিতামহ পরম বৈষ্ণব গুরুপ্রসাদ বসু বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বৃন্দাবনে একটি 'কুঞ্জ' নির্মাণ করেন, ইহা 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে খ্যাত। এই কুঞ্জে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী, পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকে কঠোর তপস্যা করেন। গুরুপ্রসাদ বসু কর্তৃক স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ জীউ বিগ্রহের নামানুসারেই উত্তর কলিকাতায় একটি পল্লীর নাম হয় শ্যামবাজার, ইহাও তাঁহার উজ্জ্বল কীর্তির নিদর্শন। ভক্ত বলরামের পিতৃদেব রাধামোহন বসু বিষয়কর্ম হইতে দূরে থাকিয়া বৃন্দাবনে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিতেন।

ভক্ত পরিবারে জন্মলাভ এবং পূর্বজন্মার্জিত নিজ শুভ সংস্কারের ফলে বাল্যকাল হইতেই বলরামের মন ঈশ্বরাভিমুখী হইয়াছিল। সদালোচনা সচ্চিন্তা এবং সদ্‌গ্রন্থপাঠে তাঁহার বহু সময় ব্যয়িত হইত।

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণভাবিনীর সহিত বলরামবাবু পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ

হইয়াছিল যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ। ইহা স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সাধনার পথ প্রশস্ততর করিয়া দিয়াছিল। ভক্ত বলরামের উপযুক্ত সহধর্মিণী-রূপে মহীয়সী কৃষ্ণভাবিনী সর্বকার্যে তাঁহার সহায়িকা হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কৃষ্ণভাবিনী শ্রীমতীর (রাধারাণীর) অষ্ট সখীর প্রধানা।

বিবাহের পর বলরাম ওড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত তাঁহাদের ভদ্রক মহকুমার কাছারী বাটীতে কিংবা ভদ্রক হইতে কিছুদূরে অবস্থিত কোঠার গ্রামের বাড়ীতে কখনও বা ৺পুরীতে থাকিতেন। তখন তাঁহার বিশেষ কাজ হইয়াছিল পৈতৃক বিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদের পূজা সেবা ও ভাগবত ভক্তমাল প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ। বিষয়কর্ম ভাল লাগিত না বলিয়া জমিদারির কাজে মন দিতে পারিতেন না।

পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন ঃ বলরামের ভিতর দয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল।

পুরীধামে জগন্নাথক্ষেত্রে দীর্ঘ একাদশ বৎসর থাকিবার পর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়, ইচ্ছা ছিল কয়েক সপ্তাহ পর পুনরায় পুরীতে গিয়া থাকিবেন। কিন্তু সংসারে বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গে অত্যধিক প্রীতি দেখিয়া তাঁহার পিতা ও ভ্রাতারা তাঁহার কলিকাতাতেই থাকা উচিত বলিয়া ভাবিয়াছিলেন।

এই সময় বলরামবাবুর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র কটকের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রায় বাহাদুর হরিবল্লভ বসু বাগবাজার ৫৭নং

রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের বাড়ীটি ক্রয় করেন এবং এখানে বলরাম-বাবুকে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। পরম বৈষ্ণব ভক্ত বলরাম ভ্রাতাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এই ভবনেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পুরীতে বাস করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, জগন্নাথ দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না, জগন্নাথ-প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু আহারে তাঁহার আদৌ রুচি হইত না। যাহা হউক কলিকাতায় থাকিতে হইলেও স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের কৃপায় তাঁহার দর্শন ও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলেন না—ইহাই বলরামবাবুর পরম সৌভাগ্য।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করিতেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এক অপূর্ব মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার মুহুর্মুহুঃ সমাধি হইয়া থাকে, তাঁহার শ্রীমুখের অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ বিমুগ্ধ। কেশবচন্দ্র-সম্পাদিত 'সুলভ সমাচারে' বলরামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনকথা পাঠ করিলেন—তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ঐকান্তিকী শুভ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। সুযোগ আসিল; একদিন ভক্ত রামদয়ালকে সঙ্গে করিয়া বলরামবাবু দক্ষিণেশ্বরে

উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন ভক্তপরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে—মনে হইল নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য পুনরায় নরশরীরে অবতীর্ণ! যাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণে কত আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন আজ তাঁহার অলৌকিক দিব্যভাব, অপূর্ব সংকীর্তন ও নৃত্য দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক হইল! হৃদয়ক্ষেত্রে যে দুর্বার ভক্তিতরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছিল তাহা যেন মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল!

সকলে একে একে মন্দির-প্রাঙ্গণে চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামকে একান্তে পাইয়া স্নেহসিক্ত-কণ্ঠে বলিলেন, 'তোমার কি কথা আছে বল।' বলরাম যুক্তকরে নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'আমার পিতা পিতামহ সকলেই বৈষ্ণব ও ভক্ত, হরিনাম ক'রে আজীবন কাটাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি। তথাপি আজও ভগবানের দর্শন-লাভ হ'ল না।' শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'আপনার ভেবে ভগবানকে ডাকলে তিনি দর্শন দেন।'

বলরাম বসু আজ নূতন আলোক পাইলেন—সাধন-মার্গের অভিনব তত্ত্ব তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইল। এতদিন পূজাজপ-ধ্যানাদিতে রত থাকিলেও বুঝিলেন, এই ভাবে তাঁহার ভগবানকে ডাকা হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তিনি জন্মের মত মন প্রাণ নিবেদন করিলেন।

বিদায়ক্ষণে ঠাকুর আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে বলিলেন। গৃহে ফিরিয়া সেই রাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাতেই কাটিল—সমস্ত

হৃদয় জুড়িয়া যিনি আসন পাতিয়াছেন তাঁহার চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা আসিবে কিরূপে !

পরদিন প্রত্যুষেই পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর অত্যন্ত আত্মীয়তা সহকারে জানাইলেন, 'ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন ; তুমি যে মার একজন রসদ-দার, তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে, কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।'

সেইদিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শন-দিন পর্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্যের প্রয়োজন হইত প্রায় সমস্তই বলরামবাবু পাঠাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের অন্ন খুব শুদ্ধ।'

দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরে গমন ও ভাগবতী কথা শ্রবণ চলিতে লাগিল—যতই দর্শন করেন আশ মেটে না—নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়—সদা সর্বদা তাঁহার অমৃতবাণী শুনিতে ইচ্ছা হয়।

বলরামবাবুর চারিত্রিক মাধুর্য ছিল অতুলনীয়। বিনয়, সরলতা, দান, ভক্তসেবা প্রভৃতি গুণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-মণ্ডলীর অতি প্রিয় ছিলেন। বেশভূষার পারিপাট্যের মধ্যে তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গৌর-বর্ণ পুরুষ—শ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথায় শিখদিগের মত পাগড়ী, পরিধানে ধুতি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার বলরামবাবুর চরিত্রালেখ্য অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন ঃ

ভক্তবংশে প্রভুভক্ত যাঁদের জনম।
এমন প্রভুর ভক্ত অতিশয় কম॥
একমাত্র বলরাম বসু জমিদার।
দ্বিতীয় তাঁহার মত মেলা অতি ভার॥
ধীর নম্র বিনয়ী সংসারী ভক্তবর।
বিভূষিত সর্বগুণে গুণের সাগর॥
আস্যে মৃদুমন্দ হাস্য খেলে অবিরাম।
মিতব্যয়ী সন্তোষ-অন্তর বলরাম॥
গোপনে গোপনে আনে প্রভু ভগবানে।
মহাপুণ্যময় তীর্থ নিজ নিকেতনে॥
সরল আকৃতি অতি পাতলা গড়ন।
শুভ্র পরিচ্ছদ শিরে পাগ শোভমান॥
বাঙালীর রীতি ছাড়া উচ্চ পাগ শিরে।
বিনয়েতে সদা নত ভূমির উপরে॥
জমিদার বলরাম ঘরে কত ধন।
দুয়ারে দণ্ডয়মান দীনের মতন॥
ভিখারীর চেয়ে ন্যূন দীন হীন ভাবে।
বাসনা কেবল দরশন প্রভুদেবে॥
ভক্তি-দীনতার তত্ত্ব জীবগণে দিতে।
মূর্তিমান বলরাম শ্রীপ্রভুর সাথে॥
ভক্তিপ্রিয় বলরাম বৈষ্ণব আচারী।
ভক্তজনে পাইলেই যত্ন বাড়াবাড়ি॥

কত ভক্ত আসে যায় তাঁহার ভবনে।
যত্নবান সর্বদা সাদর সম্ভাষণে ॥
মহাভক্ত বলরাম বৈষ্ণব লক্ষণে।
প্রভু-অবতারে নয় অবতার-ক্রমে ॥
বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি ॥
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অবতারে।
অন্ন-ভিক্ষা শ্রীপ্রভুর তাই তাঁর ঘরে ॥

বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়া ও তাঁহার চরণকমলে আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অন্তরঙ্গ যে যেখানে আছে সকলকেই অমৃতের সন্ধান দিতে হইবে। তাই আপনার জন বলিতে যে যেখানে ছিল, একে একে সকলকেই সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে অলৌকিক দিব্য পুরুষের সন্নিধানে লইয়া আসিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনধাম হইতে নিজের পিতৃদেবকে আনাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও অপূর্ব ভাগবত প্রসঙ্গ শ্রবণের সুযোগ করিয়া দিলেন। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের ভ্রাতা, ভগিনী ও পরিবারের সকলেই বলরামবাবুর সহায়তায় ঠাকুরের দর্শন ও কৃপা লাভে ধন্য হইলেন। যে আনন্দে তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইতেছিল এখন সকলে মিলিয়া সেই আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

বলরামবাবুর তিনটি সন্তান—ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য

হইয়াছিলেন। বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ছিলেন অত্যন্ত ভক্ত-সেবাপরায়ণ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও পার্ষদগণের আজীবন সেবা দ্বারা তিনি ভক্তসেবার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় যখন কাশীপুরে যাওয়া স্থির হয় তখন ব্যয়নির্বাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাড়ীভাড়ার টাকা এবং বলরামবাবু খাওয়ার খরচ দিতে সানন্দে স্বীকৃত হন।

ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ অনেক বিষয়েই বলরামবাবুর উপর নির্ভর করিতেন। বরাহনগর মঠের আদিম অবস্থায় বলরামবাবু একদিন মঠে গিয়া দেখেন মঠের ভ্রাতারা শুধু শাকান্নের দ্বারা উদরপূর্তি করিতেছেন; অতঃপর তিনি ঠাকুর-সেবার জন্য প্রতিদিন এক টাকা দিতেন এবং সংবাদ লইয়া অন্যান্য অভাব দূর করিতেন।

সংসারে পাঞ্চভৌতিক শরীর চিরদিন থাকে না। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অপর বহু ঘনিষ্ঠ পার্ষদের ন্যায় বলরামবাবুও অল্পবয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করিলেন (১লা বৈশাখ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ ; ১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০ খৃঃ)।

৪৮ বৎসর মাত্র এই মহাভক্ত ইহলোকে ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার জীবন-কুসুমটি সহস্রদলে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—পিছনে রহিয়া গিয়াছে ভাবী কালের ভক্তবৃন্দের জন্য উদ্দীপনাময়ী প্রেরণা ও আদর্শ গৃহস্থ জীবনের সুষ্ঠু পথনির্দেশ।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ *

ভগবান ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। যুগে যুগে যখন তিনি ধর্ম-স্থাপনের জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার লীলাপার্ষদ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকেও সঙ্গে লইয়া আসেন। তাই দেখা যায় ভক্তবৃন্দ ও ভক্তপরিবারের সঙ্গে ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না। লীলা আস্বাদনের সময় শ্রীভগবানের অশেষ করুণা, অজস্র কৃপা ভক্তগণের উপর বর্ষিত হইতে থাকে।

বলরাম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে বার বার দর্শন করিয়াছেন—চক্ষু সার্থক হইয়াছে; তাঁহার অমৃতবাণী কত শ্রবণ করিয়াছেন—কর্ণও পরিতৃপ্ত; তবু কোথায় যেন অন্তরের অন্তস্তলে একটি আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছে যাহার জন্য ঠিক ঠিক শান্তি পাইতেছেন না। নির্জনে ভাবিতে লাগিলেন, মন যেন বলিয়া দিল শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের বাটীতে আনিতে না পারিলে শান্তি হইবে না। তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের মনোবাসনা সাগ্রহে নিবেদন করিলেন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ না করিয়া পারেন না—ভক্তেরই যে ভগবান।

যেদিন রামকৃষ্ণদেব বলরাম-মন্দিরে প্রথম শুভাগমন করেন সেই দিনটি ছিল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ; ফাল্গুন

---

* এই পরিচ্ছেদের কতকগুলি উদ্ধৃতি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পুস্তকাবলীর বিভিন্ন স্থল হইতে প্রয়োজনানুযায়ী গৃহীত ও সংকলিত।

কৃষ্ণা সপ্তমী—সন্ধ্যাকাল। মাত্র সাত দিন হইল শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব হইয়া গিয়াছে, ভক্তচিত্তে অনুরাগের আভা এখনও ম্লান হইয়া যায় নাই। ধরণী জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত করিয়া আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত না হইলেও বলরামের গৃহে আজ পূর্ণচন্দ্র শোভমান। চারিদিকে ভক্তগণ। আজ বলরামের আনন্দের সীমা নাই। তিনি যুক্তকরে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছেন ও ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইতেছেন। দেখিলে মনে হয় না তিনিই গৃহস্বামী। —যেন 'তৃণাদপি সুনীচেন' দীনভাবের মূর্তিমান্ বিগ্রহ।

রাত্রি আটটা-নয়টার সময় মাষ্টার মহাশয় আসিয়া দেখিলেন রাম, মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। হরিনাম-সংকীর্তন চলিতেছে —সকলেই মাতোয়ারা। কয়েকজনের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ...রাখাল ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি বাহ্য-সংজ্ঞা-শূন্য, —দেহ অবলুণ্ঠিত। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া 'শান্ত হও, শান্ত হও' বলিতেছেন। মাষ্টার মহাশয়ের মতে রাখালের ইহাই দ্বিতীয় ভাবাবস্থা। [২]

ইহার পরে বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন-সম্বন্ধে যে বিবরণটি পাওয়া যায় তাহা হইল ১৫ই নভেম্বরের (১৮৮২ খৃঃ)। সমবেত ভক্তগণের সহিত ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশ্বরের কথা ছাড়া মুখে অন্য কিছুই নাই।

২ কথামৃত ৫।১।১।১ পৃষ্ঠা

জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠিল। ঠাকুর বলিলেনঃ এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হ'লেই দেহ মন আত্মা—সব শুদ্ধ হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।[৩]

সকলেরই দৃষ্টি ঠাকুরের শ্রীমুখের উপর নিবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বদ্ধ জীব ও মুক্ত জীবের কথা বলিতে লাগিলেনঃ সংসারী বদ্ধ জীব যেন গুটীপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু অনেক যত্ন ক'রে গুটী তৈরী করেছে ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই মৃত্যু হয়।[৪]

অমনি তিনি মধুরকণ্ঠে গান ধরিলেনঃ

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে॥[৫]

মধুর সুর-লহরী বাতাসে খেলিয়া বেড়াইতেছে। ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ—তাঁহাদের মন উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যাইতেছে।

গান শেষ হইলে 'গৃহস্থদিগের সঞ্চয় করা অবশ্য কর্তব্য' সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ গৃহস্থের কর্তব্য আছে, ঋণ আছে; দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, আবার পরিবারবর্গের উপরও ঋণ আছে। সাধ্বী স্ত্রী হ'লে তাকে প্রতিপালন করতে

---

৩ কথামৃত ৫।২।২।২৪ পৃষ্ঠা। ৪ ঐ ৫।২।২।২৪ পৃষ্ঠা। ৫ ঐ ৫।২।২।২৫ পৃষ্ঠা

হয়; সন্তানদিগকে লালন-পালন করতে হয়, যতদিন না সাবালক হয়। [৬]

ইহার পরে আমরা বলরাম-মন্দিরের যে প্রসঙ্গ পাই তাহা হইয়াছিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল। শনিবার, অমাবস্যা, ২৫শে চৈত্র; বেলা একটা। ঠাকুর বলরামের বাটীতে সকালে আসিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন ঠাকুরের আগ্রহে ও বলরামের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এবং আরও দুই একটি ভক্ত বলরাম-ভবনে আহার করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামকে বলিতেন: এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়।

আহারান্তে বৈঠকখানার উত্তরপূর্বের ঘরে বসিয়া আলাপ হইতে লাগিল। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরা সহযোগে গাহিতে লাগিলেন:

আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী গাওনা রে। (ইত্যাদি)

ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছেন।

গানের পর নরেন্দ্রনাথ ভবনাথের মাছ-পান ত্যাগের কথা সহাস্যে জানাইলেন। ঠাকুর তখন সকৌতুকে বলিলেন:

---

৬ কথামৃত ৫।২।২।২৬ পৃষ্ঠা

সে কি রে? পান-মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই ত্যাগ। [৭]

অপরাহ্ণে ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন: শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হ'য়ে যায়। [৮]

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন বলরাম-ভবনে ভক্তগণ আর একবার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য দর্শন পাইয়াছিলেন। ঐদিন তিনি বলরামবাবুর বাটী হইতে শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে মনোহর সাঁই কীর্তন এবং সেখান হইতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহে কথকতা শুনিতে গিয়াছিলেন।

ঠাকুর গাড়ী করিয়া আসিতে আসিতে ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন: দেখ তাঁর উপর ভালবাসা এলে পাপ টাপ সব পালিয়ে যায়, সূর্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরের জল শুকিয়ে যায়। [৯]

বলরাম-মন্দিরে ঠাকুরের সেদিনকার অবস্থান স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও ভাবগম্ভীর।

ইহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুনের একখানি অনুপম চিত্র পাওয়া যায়। বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। পার্শ্বে মাষ্টার ও রাখাল বসিয়া আছেন। ভাববিহ্বল অবস্থায় ঠাকুর বলিতেছেন: দেখ, আন্তরিক

---

৭ কথামৃত ৪।৩।১।১৭ পৃষ্ঠা। ৮ ঐ ৪।৩।১।১৮ পৃষ্ঠা। ৯ ঐ ৫।৬।১।৬২ পৃষ্ঠা

ডাকলে স্ব-স্বরূপকে দেখা যায়। কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে সেদিন উপনিষদের 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—আত্মাকে যে ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করেন স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা তাঁহারই নিকট উদ্ঘাটিত হন'—এই বাণী যেন নূতনভাবে সহজ সরল ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছিল : তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হ'লে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।[১০]

ঠাকুর লীলার কথা বলিতে লাগিলেন : ঈশ্বর মানুষ হয়ে অবতাররূপে যুগে যুগে আসেন প্রেমভক্তি শেখাবার জন্য।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট, বলরাম-বাটীতে পদার্পণ করিয়া ঠাকুর স্বল্পকাল অবস্থান করিলেও যে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।[১১]

* * * *

এখন আমরা বলরাম-মন্দিরে রথোৎসবের বর্ণনা করিব। রথের সময়ে বলরামবাবুর বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত। কাষ্ঠনির্মিত ছোট একখানি রথ। কিন্তু রথ ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, আনন্দের দিক দিয়া, ভক্তির দিক দিয়া ছোট্ট রথখানিকে ঘিরিয়া যে উৎসব হইত তাহার

---

১০ কথামৃত ৫।৭।২।৮৩ পৃষ্ঠা   ১১ ঐ ৫।৭।৪।৮৯ পৃষ্ঠা

তুলনা মিলে না। সমস্ত ভক্তের চিত্তে যেন 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' এই চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা থাকিত না। কেহ ভাবোন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার দিতেন, কেহ বা উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। অবিরাম সঙ্কীর্তনের তরঙ্গ খেলিয়া চলিত। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরও বলরাম-ভবনে সেই আনন্দে বিভোর হইতেন। পার্ষদ-সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবঘন আনন্দময় মূর্তি সেই সঙ্কীর্তনের মধ্যে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জন্ম সার্থক।

পূজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার এই রথোৎসব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই।···ছোট একখানি রথ বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত—একদল কীর্তনিয়া আসিত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্‌-ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সেই মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে ও শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা! এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্তনের পরে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে বলরাম-ভবনের রথোৎসব-বর্ণনা ঃ

"অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্মিত।
দ্বিতলের বারাণ্ডায় টানিবার মত॥
শোভে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকায়।
পাশের চৌদিকে প্রতি ধ্বজায় ধ্বজায়॥
সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে।
সেখানে তেমন ধারা যেখানে যা সাজে॥
সুরঞ্জিত রথরজ্জু করিয়া বন্ধন।
ঠাকুর আনিতে চলে পূজারী ব্রাহ্মণ॥
বাজে বাদ্য ঝাঁজঘণ্টা মনে কুতূহলী।
ঘন ঘন কীর্তনিয়া খোলে দিল তালি॥
তার সঙ্গে করতাল উঠিল বাজিয়া।
পূজারী ঠাকুর আনে জলধারা দিয়া॥"

রথের মধ্যে বিগ্রহগুলি যথাস্থানে রাখা হইল। ভক্তবৃন্দের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি রথের প্রতি নিবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

"শ্রীকরে ধরিয়া রজ্জু টান দিলা রথে।
সংকীর্তন-সহ প্রভু নাচিতে নাচিতে॥"

বোধ হইল যেন শ্রীবাস-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি-

প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কীর্তন চলিতেছে—

আমার গৌর নাচে।

নাচে সংকীর্তনে শ্রীবাস-অঙ্গনে ভক্তগণ সঙ্গে।

ঠাকুর আখর দিতেছেন—

আমার গোরা নাচে রে—

প্রাণের গোরা নাচে রে।

"ভক্তগণ যোগ দিলা সঙ্গেতে প্রভুর।

প্রেমে ভরা প্রেমোন্মত্ত প্রেমের ঠাকুর॥

কভু রজ্জু পরিহরি প্রমত্ত কীর্তনে।

অপূর্ব প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে॥"

কোন কোন ভক্ত ভাববিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নাচিতেছেন—সংকীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়াছেন।

"ভক্তবসু বলরাম মাথায় পাগড়ি।

নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি॥

কৃষ্ণকায় তেজচন্দ্র বসু চুনিলাল।

শ্রীমনোমোহন রাম দেবেন্দ্র রাখাল॥

কৃতদার হরিপদ· হরিণনয়ন।

সুন্দর শরৎ শশী কুমার দুজন॥

বারাণ্ডা কাঁপায়ে নাচে অভিমানিবর।

বিশ্বাসী গিরিশ ঘোষ গুরুকলেবর॥

নাচেন নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।

সাকার হৃদয়ে যাঁর নাহি পায় স্থান॥"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম, রামনাম, কৃষ্ণনাম, হরিনাম করিতেছেন। ভক্তগণ নিঃশব্দে শুনিতেছেন। এত সুমিষ্ট নামকীর্তন—যেন মধুবর্ষণ হইতেছে।

ঠাকুর গাহিতেছেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
তারা, তারা দুভাই এসেছেরে।

আজ বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে শ্রীবৃন্দাবন।

সংকীর্তন ও নৃত্য সহ রথ টানা সাঙ্গ হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম, শ্রীমতী সুভদ্রা, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গসকলের নাম উচ্চারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি প্রদান করিলেন।

এইবার প্রসাদ-ধারণের পালা। নম্রতার প্রতিমূর্তি ভক্ত-সেবক বসু মহাশয় আজ সকলকে প্রসাদ দিবেন—তৃপ্তিতে আত্মপ্রসাদে তাঁহার প্রাণ ভরপুর। বলরামবাবু সকলের কাছে গিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

"দীনতা-পূরিত কথা সুধা ঝরে তায়।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ কিবা শোভা পায়॥
করযোড়ে মিনতি করেন জনে জনে।
কিছু কিছু ঠাকুরের প্রসাদ-ধারণে॥"

ভক্তবৃন্দ পরম পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

বলরাম-মন্দিরে রথোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদান সম্বন্ধে

এইরূপ তুইখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়ঃ ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথোৎসবের বিবরণী।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরামবাবুর বাটীতে আরও বহুবার পদধূলি দেন। এখানে ভক্তবৃন্দের নিকট ঠাকুর একদিন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেনঃ

নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নেই।...নরেন্দ্র কোন কিছুর বশ নয়,—আসক্তি ও ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়, এ সবের বহু উর্ধ্বে সে।[১২]......

বলরামবাবুর পিতা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। তিনি সর্বদা আপন মনে আপন ভাবেই থাকেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য বলরামবাবু নিজের পিতৃদেবকে পত্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছেন। ঠাকুর একদিন বলরাম-বাটীতে বলরামবাবুর পিতাকে বহুমূল্য উপদেশ দেন।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।...যে সমন্বয় করেছে সেই-ই লোক। অনেকেই এক ঘেয়ে—আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত—সবই সেই একককে নিয়ে। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।[১৩]

---

১২ কথামৃত ৫ম ভাগ পরিশিষ্ট পৃঃ ১। ১৩ ঐ ৪। ১২। ১১৯—২০

বলরামবাবুর গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের প্রথম আলাপ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলেন : ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ মানুষে খুঁজবে। যে মানুষ ঈশ্বরের জন্য পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।[১৪]

ঠাকুর গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গান হইতে লাগিল—

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী ॥

চৈতন্যলীলার এই গানটি গিরিশচন্দ্রের রচিত জানিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই দিন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে বৃথা পাণ্ডিত্যের নিন্দাসূচক যাহা উচ্চারিত হয় তাহা পাণ্ডিত্যাভিমানাদের অভিমান চূর্ণ করে : পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর থাকে কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায় ; যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে।

বাস্তবিক শুধু পাণ্ডিত্যে 'বস্তু'লাভ হয় না। সাধন না করিলে পাণ্ডিত্য নিষ্ফল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন :

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন না কেউ দেখে ॥[১৫]

---

১৪ কথামৃত—১। ১৪। ২। ২২৭ পৃষ্ঠা। ১৫ ঐ ১। ১৪। ৩। ২৩০-৩১ পৃঃ

* * * *

প্রকৃত প্রার্থনা কিরূপ হওয়া উচিত—জীবকে শিখাইবার জন্য নরদেহধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই বলরাম-মন্দিরে তাহা নির্গত হইয়াছিল। অশেষ কল্যাণকর এই নিষ্কাম প্রার্থনা ভক্তি-সাধনার মহামন্ত্র ঃ

মা, আমি শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি।[১৬]

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে উপদেশ-প্রসঙ্গে বলেন ঃ ঈশ্বরের কৃপা হ'লে একক্ষণেই সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে, হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—হঠাৎ যদি কেউ প্রদীপ আনে তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।[১৭]

পরে নরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি গান গাহিলেন। সেদিন তিনি যে গানগুলি গাহিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি ছিল ঃ

বিপদভয় বারণ যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না ?
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছ ভবঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা!

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

---

১৬ কথামৃত ১।১৪।৪।২৩৪ পৃষ্ঠা ১৭ কথামৃত ৩।১৫।১।২৩০ পৃষ্ঠা

ভক্তবৃন্দ তন্ময় হইয়া নরেন্দ্রনাথের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন—শুনিয়া আর আশা মিটিতে চাহে না, যতই শোনেন আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়। ভক্তেরা আবার গাহিতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্র গাহিতে লাগিলেন ঃ

হরি-রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।

আরও কয়েকখানি গানের পর নরেন্দ্র নিজের মনে গান ধরিলেন ঃ

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ।।

সমাধির গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তবৃন্দ নিষ্পলক নেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিলেন।

বাহ্যজ্ঞান লাভ হইলে ঠাকুর ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন ঃ ঈশ্বরেতে বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই আছে। বিদ্যা-মায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যা-মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাৎ করে। বিদ্যার খেলা—জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য ; এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পোঁছানো যায়। [১৮]

সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভাবমুখে বলিলেন ঃ ঈশ্বরকে আন্তরিক যে জানতে চাইবে তারই হবে—হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। [১৯]

* * * *

১৮ কথামৃত ৩।১৫।৩।২৪১ পৃষ্ঠা ১৯ কথামৃত ৩।১৫।৪।২৪৪ পৃষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার গলরোগ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি ষ্ট্রীটে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গাতীরে মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত-আলোবাতাসহীন স্বল্পপরিসর গৃহে অবস্থান সম্ভব হইল না। তিনি পদব্রজেই ভক্তসঙ্গে বলরাম-মন্দিরে আসিলেন। বলরামের আনন্দের সীমা নাই। ভক্তপ্রবর বলরাম যতদিন না মনোমত বাটী পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন। করুণাময় ঠাকুর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। চিকিৎসা ও পথ্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইল। ভ্রাতা ভগিনী—বাবুরাম ও কৃষ্ণভাবিনী উভয়ে প্রাণপণে ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন।

অভিজ্ঞ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঠাকুর বলিলেন, রোগ সাধ্য না অসাধ্য? গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'ব্যাধি দুঃসাধ্য'। এই কথা ঠাকুরের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি মৃদু মৃদু হাসিয়াছিলেন। যিনি ভব-রোগবৈদ্য তাঁহার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য! বোধহয় লীলা-সংবরণের সময় আসন্নপ্রায় ভাবিয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে সেদিন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-ভবনে অবস্থিতি লোকমুখে কলিকাতার সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তি দলে দলে আসিতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে সানন্দে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকগণের নিষেধ ও ভক্ত-গণের সকরুণ প্রার্থনায় কোন ফল হইল না। এই সময়ে যেরূপ উৎসাহের সহিত ঠাকুর ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে মনে করিলে ভুল হইবে না যে, তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না তাহাদিগকে ধর্মের আলো দিবার জন্যই যেন কিছু দিনের জন্য তিনি কৃপা করিয়া তাহাদের নিকটতর হইয়াছেন। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ আবার বিকাল হইতে রাত্রির আহার পর্যন্ত ঈশ্বরীয় কথা চলিত। বহু ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট হইলেন— অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্নসকলেরও সমাধান হইল। নিত্য নূতন নূতন ভক্তের সমাগমে এবং ভজনসঙ্গীতে বলরাম-ভবন উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভজন-কীর্তনাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু অধ্যাত্ম-পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ করিলেন।

এই সময় একদিন ভাবমুখে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, 'এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস! লোকের ভিড়ে নাইবার খাবারও সময় পাইনে। একটা তো এই ফুটো ঢাক (নিজের শরীরটিকে লক্ষ্য করিয়া) রাতদিন বাজালে আর ক'দিন টিকবে?'

কিন্তু বিরামবিহীনভাবে ঢাক বাজিয়া চলিয়াছে! বিশ্রাম কোথায়—অবসর কই? অহেতুক-কৃপাসিন্ধু লোকপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে লোককল্যাণ সাধন করিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরাম-বাটীতে এই ছয় সাত দিন যেভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার একদিনের একটি অতি সুন্দর চিত্র পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী 'লীলাপ্রসঙ্গে' পরিবেশন করিয়াছেন ঃ

"এক দিবস অপরাহ্নে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলে বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ ও গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন—

আমায় ধর নিতাই,
আমার প্রাণ যেন করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্‌জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে
অষ্টসখী সাক্ষী তাতে
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হইল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। ঐরূপে উপর্যুপরি তিনবার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।”

ইহাই বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানের সর্বশেষ স্মৃতি। এখান হইতে যুগাবতার শ্যামপুকুর-বাটীতে গমন করেন।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমা *

জগতে মাতৃভাব বিকাশের জন্য আবির্ভূতা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী বলরাম-ভবনে বহুবার আগমন ও অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি হইতে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমা বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "রামের মার (বলরামবাবুর স্ত্রীর) অসুখ হয়েছিল, ঠাকুর আমায় বললেন, 'যাও,দেখে এস গো।' আমি বললুম, 'যাব কিসে? গাড়ী টাড়ী নেই।' ঠাকুর বললেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও।' শেষে পালকি পাওয়া গেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে এলুম। দু'বার এসেছিলুম। আর একবার—তখন থাকি শ্যামপুকুরে, রাতে হেঁটে রামের মার অসুখ দেখতে এলুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর পরমভক্ত বলরামবাবু শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদিকে তাঁহার বাগবাজার বাটীতে লইয়া আসেন (৬ই ভাদ্র, ১২৯৩ ; ইং ১৮৮৬ খৃঃ)। এই সময় মায়ের সদ্যোবিয়োগবিধুর মনের অবস্থা কে বুঝিবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসান-জনিত নিদারুণ বিরহ তো সহজে ভুলিবার নয়—

---

* প্রসঙ্গক্রমে সম্পর্কিত অন্যান্য স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের গমনাগমন ও অবস্থিতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রতিটি মুহূর্তে তখন শ্রীমায়ের কেবলই মনে পড়িতেছিল যে, ঠাকুরের প্রকট বিগ্রহ আর নাই। ইহা ভক্তগণেরও অজানা ছিল না। তাই ভক্তগণ তাঁহাকে তীর্থদর্শনে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন, কারণ পবিত্র তীর্থসমূহে শ্রীভগবানের নিত্যাবির্ভাবের নিদর্শন পাইলে এই দুর্বিষহ দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে। এই বিষয়ে বলরামবাবু উদ্‌যোগী হইলেন। শ্রীশ্রীমা বলরাম-ভবনে আট দিন থাকিয়া ১৫ই ভাদ্র শ্রীবৃন্দাবন-তীর্থে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি ও মাষ্টার মহাশয়ের সহধর্মিণী এবং পূজ্যপাদ যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ ও কালী মহারাজ। বৃন্দাবনে বলরাম-বাবুর পূর্বপুরুষগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যমুনা-পুলিনস্থ ঠাকুরবাড়ী 'কালাবাবুর কুঞ্জে' মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পুণ্যলীলাস্মৃতি-বিজড়িত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীমা মানসিক শান্তি লাভ করিলেন।

শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে প্রায় এক বৎসর ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নানা অতীন্দ্রিয় দর্শন হইত। সঙ্গিনী যোগীন-মা প্রভৃতির স্পষ্টই বোধ হইত, মা যেন সদা ভাবমুখে রহিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনাদি হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে দর্শন দিয়া যোগানন্দ মহারাজকে মন্ত্র দিতে বলিয়াছিলেন।

উত্তর ভারতের বহু তীর্থ দর্শন করিয়া ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীমা কলিকাতা আসেন এবং বলরাম-মন্দিরে কয়েক দিন থাকার পর কামারপুকুরে যান।

শ্রীশ্রীমায়ের বলরাম-মন্দিরে অবস্থানের একখানি চিত্র সন্তান-গণের চিত্তে চির-উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য ঃ

১৮৮৮ (বাং ১২৯৫) খৃষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীশ্রীমা ভক্ত-দিগের আহ্বানে কামারপুকুর হইতে বলরাম-ভবনে আগমন করেন। এই সময় তিনি সর্বদা ধ্যান-তদ্গতভাবে থাকিতেন। একদিন বলরামবাবুর বাড়ীর ছাদে ধ্যান করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থা হন এবং বুত্থিত অবস্থায় যোগীন-মাকে বলেন, 'দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদর-যত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর সেখানে রয়েছেন। তাঁর পাশে আমায় আদর ক'রে বসালে—সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হ'তে দেখি যে শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি ক'রে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকব ? অনেক পরে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁশ এল।'

এই সময়ে ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া যান। মা এই বাড়ীতে কঠোর তপস্যারত অবস্থায় ছয় মাস ছিলেন। এখান হইতে বলরাম-বাটীতে আসিয়া এবং দুই এক দিন থাকিয়া ৫ই নভেম্বর তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে ৺পুরী-ধামে যাত্রা করেন।

পুরীতে মা বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীধামে আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করেন নাই বলিয়া মা

একদিন ঠাকুরের ছবি সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করান। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'ছায়া ও কায়া সমান।' শ্রীক্ষেত্রে দুইমাস অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমায়ের বহুবিধ দর্শন হইয়াছিল। একবার তিনি ৺পুরুষোত্তমকে শিবরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। পুরীধামে মা যখন দ্বিতীয়বার আসেন তখন 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' না থাকিয়া বলরাম-বাবুদের অপরগৃহ সমুদ্রের নিকটস্থ 'শশী-নিকেতনে' ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হইবার পর শ্রীশ্রীমা বলরাম-মন্দিরে বহুবার বাস করিয়াছিলেন এবং বলরামবাবু, তাঁহার পত্নী ও পুত্র আজীবন মায়ের ও ভক্তবৃন্দের সেবাযত্ন করিয়া মা যে কিরূপ করুণাময়ী ও মমতাময়ী তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে (১২৯৭) এপ্রিল মাসে ভক্তপ্রবর বলরাম-বাবুর কঠিন অসুখ হয়। বোধহয় মাটির পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া তিনি সুখদুঃখের অতীত লোকে, শাশ্বত শান্তির রাজ্যে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন ৺গয়াতীর্থ হইতে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। করুণাময়ী জননী পরমভক্ত বলরামের প্রভুসেবা, ভক্তসেবা এবং তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপার কথা স্মরণ করিয়া বলরাম-গৃহিণী ভক্তিমতী কৃষ্ণভাবিনীর প্রার্থনায় তাঁহার বাটীতে চলিয়া আসেন। বলরামবাবু মহা-প্রয়াণের সময় ভক্তের পরম সম্পদ্ জননীর অভয় আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিলেন। (১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০ খৃঃ, ১লা বৈশাখ, ১২৯৭)

১৩১৪ সনের শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা আগতপ্রায়। গিরিশ-বাবু স্বগৃহে ৺দুর্গা পূজা করিবেন; শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন ৺পূজার সময় উপস্থিত থাকিতে হইবে। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে, তিনি ভক্তের আহ্বানে সাড়া দিলেন। বলরাম-ভবনে মায়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মা আসিয়া এই সময়ে বলরামবাবুর বাড়ীতে একমাস ছিলেন। যথাসময়ে গিরিশ-গৃহে পূজা আরম্ভ হইল—শ্রীমায়ের সম্মুখেই কল্পারম্ভ হইল। এদিকে বলরাম-ভবনে আর এক পূজার সূত্রপাত হইল। সপ্তমী পূজার দিন সকাল হইতেই দলে দলে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। মা তখন অসুস্থা ছিলেন—ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া শরীর খুব দুর্বল, তথাপি তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া শত শত ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন; পরে পূজা দর্শন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন এবং পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রহিলেন।

মহাষ্টমীর দিনও শ্রীশ্রীমা বলরাম-গৃহে পূর্বদিনের মত ভক্ত-গণের পূজা গ্রহণ করিলেন, গিরিশ-ভবনেও তাঁহাকে ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণ করিতে হইল। অসুস্থতা-সত্ত্বেও কাহাকেও বিফল-মনোরথ করিলেন না। গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা হইবে। একে শরীর অসুস্থ, তাহার উপর দুই দিনের এই পরিশ্রমে মা অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিতেছেন—অতরাত্রে সন্ধিপূজায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হইবে না; সংবাদ পাইয়া গিরিশবাবুর হৃদয় দুঃখ ও ব্যথায় ভরিয়া গেল। তাঁহার অন্তরের আর্তি করুণাময়ীর হৃদয়

স্পর্শ করিল। সন্ধিপূজা আরম্ভের কিছু পূর্বে শ্রীশ্রীমা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যাব, গিরিশ বড় কাঁদছে।' একটি চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া বলরাম-মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া তিনি হাঁটিয়া গিরিশবাবুর খিড়কির দরজায় উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে গোলাপ-মা, গৌরী-মা এবং আরও কয়েক জন স্ত্রীভক্ত। শ্রীশ্রীমা গিরিশবাবুর দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'আমি এসেছি, দোর খোল।' সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। গিরিশবাবু দেখিলেন সাক্ষাৎ জগদম্বা তাঁহার পূজা গ্রহণের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া পূজামণ্ডপে অবতীর্ণা। জননীর শ্রীপাদপদ্মে জবা-বিল্বদলের অঞ্জলি দিয়া তিনি ধন্য হইলেন। তাঁহার দুর্গোৎসব সার্থক হইল। নির্বাক্ নিস্পন্দ-ভাবে শ্রীশ্রীমা দশভুজা মহামায়ার সম্মুখে দণ্ডায়মানা—যেন মা দুর্গাই মানবী মূর্তি ধারণ করিয়া সন্তানগণকে অজস্র কৃপা-বর্ষণে সিঞ্চন করিতেছেন। ভক্তবৃন্দ একে একে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। এই ভাবে নবমী পূজাও কাটিল। তিন দিনই শ্রীশ্রীমা সকলের ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। মহাপূজা শেষ হইল।

* * * *

বাগবাজারে মায়ের বাড়ী (উদ্বোধন) যতদিন তৈয়ারী হয় নাই ততদিন শ্রীশ্রীমা কামারপুকুর বা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিলে অনেক সময় বলরাম-মন্দিরেই অবস্থান করিতেন—সঙ্গে থাকিতেন স্ত্রীভক্তগণ। শ্রীশ্রীমায়ের অব-স্থানে বলরাম-মন্দিরে শান্তি ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ

তরুণবয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সংস্পর্শে আসিয়া জীবন যখন সর্বতোভাবে বিকাশোন্মুখ তখন যাঁহারা কতবার বলরাম-মন্দিরে আসিয়াছেন, কত আনন্দের স্রোতে ভাসিয়াছেন, অপরকে কত আনন্দ দিয়াছেন তাঁহাদের সহিত সপরিজন বলরামের গভীর অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরও সেই অন্তরঙ্গতায় ছেদ পড়িল না—বরং তাহা গভীর হইতে গভীরতর হইল। তাই দেখা যায় যখন বলরামগৃহে কোন শোক-তাপ-দুঃখ-দুর্দৈব উপস্থিত হইয়াছে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবন্মুক্ত ত্যাগী সন্তানগণ ছুটিয়া আসিয়াছেন অতি নিকট আত্মীয়ের মত, শোকার্তের শোক দূর করিয়াছেন তাঁহাদের সান্ত্বনাবাণীতে।

বলরাম বসু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সন্তানগণের যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাহা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। এই প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও নির্দেশে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় এই ভক্ত পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তানগণ একত্র মিলিত হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ এই ভক্ত পরিবারের উপর তাঁহার কৃপা ও এখানে তাঁহার পুণ্য লীলা স্মরণ করিয়া এই বাটীতে আগমন ও অবস্থান করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

বলরাম-মন্দির যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আগমন ও অবস্থানের বহু স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী বলরামবাবুকে বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকগুলি পত্র লেখেন, সেই সকল পত্রে বলরামবাবুর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার গভীর পরিচয় পাওয়া যায়।

বারাণসীতে থাকাকালে বলরামবাবুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া স্বামীজী রোদন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া সুপণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয় বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক করা অনুচিত।' তদুত্তরে স্বামীজীর মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার বিশাল হৃদয়বত্তা ও সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজী বলিলেন, 'বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক, আমরা মানুষ তো বটে! আর তা ছাড়া তিনি যে আমার গুরুভাই ছিলেন। আমরা এক গুরুর চরণ-তলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি। যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করিতে উপদেশ দেয় আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।'

মহাপুরুষদিগের বিরাট হৃদয়ের পরিমাপ করা সহজ নয় বলিয়া কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

'লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো বিজ্ঞাতুমর্হতি ?'

স্বামীজী বারাণসীধাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন বলরামবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিতে।

* * * *

পাশ্চাত্ত্য জগতে হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন ও বেদান্তের বীজ বপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষা সংস্কৃতি ও সেবামূলক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন আজ বহুশাখা-সমন্বিত ও বিশ্ববিশ্রুত। শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই মিশনের সূচনা বলরাম-মন্দিরেই হইয়াছিল।

স্বামীজী চাহিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার। যাহাতে দেশের জনসাধারণ উন্নত, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় উন্নত হইতে পারে এবং যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন আলোক সম্পাতে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ বিতরণ করিয়া ভারত সমগ্র মানবজাতির আচার্যপদে বৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে—ইহাই ছিল স্বামীজীর দিবারাত্র চিন্তা। এই বিষয়-গুলি মহারাজ ও গিরিশবাবুর সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া স্বামীজী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দার্জিলিং গিয়াছিলেন। দার্জিলিং শৈলশিখরে বসিয়া ইঁহারা মিলিতভাবে একটি পরিকল্পনা করেন এবং তাহার স্থায়ী রূপ দিবার জন্য তিনি কয়েক দিন পরেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

এখন আমরা 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ হইতে 'রামকৃষ্ণ মিশন সমিতি' গঠনের ইতিহাসটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম :

স্বামীজী কয়েক দিন হইতে বাগবাজারে ৺বলরামবাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে) একত্র হইতে আহ্বান করায় ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাটীতে জড় হইয়াছেন। ... স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

'নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কার্যে সহায় হোন।'

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নাম রাখা হইল—রামকৃষ্ণ-প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন।...

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী

মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারী এবং শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও লিপিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার সময় ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হইবে।

পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশ দান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

বলরাম-মন্দিরে সমস্ত সাধু ও গৃহস্থ-ভক্তের উপস্থিতিতে ও শুভেচ্ছাক্রমে দীর্ঘকাল-পরিকল্পিত ও বহুজনবাঞ্ছিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া স্বামীজী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি জানিলেন যে, গুরুদেবের হস্ত হইতে তিনি যে কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার অন্ততঃ সূত্রপাত হইল। সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দও স্বামীজীর ইচ্ছাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশ মনে করিয়া উৎসাহের সহিত বিবিধ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

এই সময় স্বামীজী কয়েক দিবস বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করেন। তখন তাঁহাকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল, তাঁহার বিশ্রামেরও অবকাশ ছিল না। এই সময় স্বামীজী পিঞ্জরমুক্ত বেদান্তকেশরীর মত থাকিতেন—যেন

'অভী'মন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ। প্রায় দিবারাত্র লোকজনের যাতায়াত ও নানা প্রসঙ্গ চলিত। বলরাম-মন্দিরে প্রায় প্রতিদিন ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষা, বিভিন্ন দেশের রাজনীতি ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে আলোচনা হইত। তাঁহার উৎসাহদীপ্ত মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া তাঁহার অমৃতময়ী সঞ্জীবনী বাণী শ্রবণ করিত।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, দেশে এমন শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক যাহাতে প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয়। বিচার-শক্তির উন্মেষ ও প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ-সাধনের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ববিধ সুযোগ থাকা উচিত। স্বামীজী বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিক্ষার আদর্শকে পুনঃপ্রচারিত করিয়া গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় মহীয়সী নারী ও ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় মহামানব সৃষ্টির সহায়তা করিবার জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে বলিতেন। প্রকৃত সৎশিক্ষার অভাবে এখন আর পূর্বের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হয় না। ভীষ্ম-দ্রোণাদির ন্যায় রথী, অর্জুনের ন্যায় শরণাগত শিষ্য, ভরত-লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা, রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মপরায়ণ নরপতি যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সেই দেশের লোকে কাপুরুষতার প্রতিমূর্তি হইয়াছে, গৃহবিবাদ ও হিংসাদ্বেষে জর্জরিত হইয়া অতি শোচনীয় দুর্দশায় কালাতিপাত করিতেছে বলিয়া স্বামীজী মর্মবেদনা অনুভব করিতেন।

স্বামীজী বলিয়ছিলেন 'এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র

ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথায়ও তেমন দেখলুম না; ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হ'ত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরী কচ্ছে! মেয়েদের একমাত্র ভারতবর্ষেই লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়, এমন আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি কত্তে পারলিনে। এদের ভিতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হ'তে পারে।'

ঐতিহাসিক যুগের প্রতাপসিংহ, পৃথ্বীরাজ, শিবাজী প্রভৃতি স্বদেশ-ভক্ত রণকুশল বীরগণের চরিত্র স্বামীজী আবেগের সহিত বর্ণন করিতেন, গুরুগোবিন্দ সিংহকে স্বামীজী বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা দিয়াছিলেন। যে মহাপুরুষ ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুগণকে পুনরায় স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার কঠোর ত্যাগ তপস্যা ও কর্তব্যনিষ্ঠা শিখজাতির হৃদয়ে নব প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল সেই গুরু গোবিন্দের চরিত্র কীর্তন করিতে করিতে স্বামীজী বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

বেদের সায়ণ-ভাষ্য আলোচনা করিবার সময় স্বামীজী বলেন, সায়ণাচার্যই বর্তমানে মনীষী মোক্ষমূলর (Maxmuller) রূপে পাশ্চাত্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহাই যদি হয়, তবে সায়ণ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া ম্লেচ্ছকুলে

জন্মগ্রহণ করিলেন কেন?' তদুত্তরে স্বামীজী বলেন, অজ্ঞানের নিকটই 'ম্লেচ্ছ' 'আর্য' এ সকল ভেদ। কিন্তু যিনি বেদের ব্যাখ্যাকর্তা, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর নিকট আবার বর্ণাশ্রম জাতিভেদ কি? তাঁর কাছে ওসব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন।'

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মোক্ষমূলর সম্বন্ধে ঐ প্রকার প্রসঙ্গ চলিবার পর স্বামীজী 'বেদ কাহাকে বলে' অতি সরলভাবে বুঝাইলেন। বলিলেন—'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি, বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এই সব সত্য প্রত্যক্ষ হয় না, সেইজন্য বেদে 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা। স্বামীজী সাধকের নির্বিকল্প অবস্থায় আরোহণ এবং তাহা হইতে বাহ্য জগতে পুনরাগমনের সহিত জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের তুলনা করিলেন। সকলের মনে হইল যেন স্বামীজী বহুবার সমাধিভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে এমনভাবে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বোঝান সম্ভব হইত না।

বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে স্বামীজী যে সব প্রসঙ্গ করিতেন, তাহা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রী৺জগদম্বার চিহ্নিত, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, তাঁহার অপরিসীম আদরের রাখালরাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও বলরাম বসুর মধ্যে একটি অপূর্ব প্রীতির সম্পর্ক ছিল। শ্রীমহারাজ যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকিতেন তখন হইতেই বলরাম-গৃহে মাঝে মাঝে বাস করিতেন। ঠাকুর নিজেই বায়ুপরিবর্তনের জন্য মহারাজকে বলরাম বসু মহাশয়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে পাঠান। বসু মহাশয়ের বাড়ীর ভক্ত মহিলা-দিগকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'তোমরা রাখালকে খাওয়াবে ও আদর-যত্ন করবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বসুপরিবারের সকলেই রাজা মহারাজকে বিশেষ আদর-যত্ন করিতেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পরে তাঁহারই নির্দেশে মহারাজ এই ভক্ত পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যখন ব্রজধামে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন তখন একদিন সহসা দেখিলেন বলরামবাবুর জ্যোতির্ময় মূর্তি, বলরামবাবু যেন হাস্যবদনে দিব্যধামে গমন করিতেছেন। মহারাজ আশ্চর্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তবে কি বলরামবাবু মর্ত্যধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন? তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম

অন্তরঙ্গ ভক্ত, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একান্ত হিতৈষী সুহৃদ, তিনি যে তাঁহার পরমাত্মীয় গুরুভ্রাতা। তাঁহার মনে বলরামবাবু সম্বন্ধে বহু অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি যে তাঁহাকে সহোদরেরও অধিক ভালবাসিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ মায়িক বন্ধন নয়, ইহা আধ্যাত্মিকতার পরম প্রেমসূত্র! মহারাজের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল। পরদিন তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, বলরামবাবু পূর্বদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'রাখাল আমার ছেলে—মানসপুত্র। দক্ষিণেশ্বরে পিতাপুত্রের অপূর্ব লীলা যাঁহারা 'কথামৃত' বা 'লীলা-প্রসঙ্গ' অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের শরীর যাওয়ার পরেও মানসপুত্রের সহিত এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল, নিম্নে বর্ণিত বলরাম-মন্দিরের একটি ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়: *

বলরাম-মন্দিরে একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মহারাজ যখন বিশ্রাম করতে যাবেন, তখন একজন বিধবা মহিলা তার ভাইকে সঙ্গে ক'রে মহারাজকে দর্শন করতে আসে। আমি (স্বামী নির্বাণানন্দ) মহারাজের ঘরের দরজার পাশে একটি বেঞ্চিতে বসে ছিলুম। সেই ভদ্রমহিলা আমাকে খুব বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'রাখাল মহারাজ কোথায়? আমি তাঁকে

* মাঘ, ১৩৬৪ উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামী নির্বাণানন্দ-লিখিত 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকথা' হইতে সঙ্কলিত।

একবার দর্শন করতে চাই,—শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। আমি বললুম, 'এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে না। এখন তিনি বিশ্রাম করতে যাবেন।' আমার কথা শুনে মহিলাটি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আমি তার সেই ভাব দেখে মহারাজকে গিয়ে তার কথা জানালুম। তিনি খুব স্নেহভরে আমায় বললেন, 'দেখ, খাওয়া-দাওয়ার পরে, এই বুড়ো বয়সে আর কথাবার্তা বলতে পারি না। ঘণ্টা দুই বাদে আসতে বলো।' এই কথা শুনে মহিলাটি নীরবে অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। পরে কাতরস্বরে আমায় বলে, 'দেখুন, আমি শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাব—এরূপ একটু ব্যবস্থা ক'রে দিন। তার এই ব্যাকুল ভাব দেখে পুনরায় মহারাজকে গিয়ে জানালুম, 'শরৎ মহারাজ এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন, শুধু একবার প্রণাম ক'রে যেতে চায়।' এইবার শরৎ মহারাজের নাম করাতে আর কোনরূপ আপত্তি না ক'রে বললেন, 'বেশ, যদি শুধু প্রণাম ক'রে যায়, তা হ'লে আসতে বল।'

সে তখন খুব আনন্দে সন্ত্রস্তভাবে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করল। প্রণত অবস্থায় মহিলাটি ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁদতে লাগল। মহারাজও হঠাৎ নির্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন। আমার তখন মহারাজকে দেখে মনে হ'ল, তিনি কোন্ এক ভাবরাজ্যে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভাব একটু প্রশমিত হ'লে সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঠ মা ওঠ; কি হয়েছে

বল।' মহিলাটি তখনও কাঁদছিল। মহারাজের স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে উঠে দাঁড়াল; কিন্তু ভাবাবেগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারছিল না। পরে মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, 'ইনিই আমায় আপনার নিকট আসতে আদেশ করেছেন।' তার এই কথা শুনে চমকে উঠে তিনি জিগ্যেস্ করলেন, 'কি হয়েছে, বলতো মা?'

মহিলাটি তখন নিঃসঙ্কোচে বলতে লাগল: "আমার চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিয়ে হয়, শ্বশুরবাড়ী বহরমপুর। বিয়ের অল্প কিছু দিন পরেই স্বামী মারা যান। তখন ভগবানের নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, 'ঠাকুর, সারাটি জীবন কি ক'রে কাটাব? তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও।' প্রায় এক বৎসর পর একদিন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'দুঃখ করো না, বাগবাজারে আমার ছেলে রাখাল আছে. তার কাছে যাও—সে তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।' কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কে রাখাল, তখন কিছুই জানি না। আমি কি করেই বা একলা বাগবাজারে যাব?

"শ্বশুরবাড়ীর কাউকে এ বিষয়ে কিছুই বলিনি। আমার মা থাকেন কলকাতায় টালিগঞ্জে। শ্বশুরবাড়ী থেকে অনুমতি নিয়ে মার কাছে এসে সব বললুম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে জানতেন। তাঁর কাছে খবর নিয়ে আমার ভাইকে সঙ্গে ক'রে উদ্বোধন-কার্যালয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বলতে তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

প্রায় ঘণ্টা তুই বাদে মহারাজ আমায় ডেকে বললেন, 'দেখ, এই মেয়েটি এখনও উপবাসী রয়েছে। এর একটু খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও।' ইতিমধ্যে তার দীক্ষাদি হয়ে গেছে। মহারাজের আদেশ পেয়ে তাকে বলরামবাবুদের অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম এবং কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললুম। মেয়েটি যখন মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাকে দেখে মনে হ'ল সেই শোক তুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার লেশমাত্রও তার ভিতরে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখালরাজের কৃপা-কটাক্ষে এমন একটা কিছু ঘটেছিল—যার ফলে সে এখন আনন্দে ভরপুর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁর মানসপুত্রের মধ্যে এই যে লীলা—সাধারণের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব।

* * * *

আর একবার মহারাজ বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা অধ্যাপক-তুহিতা ব্যাকুল হইয়া মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে আসে। মঠে আসিয়া শুনিল যে মহারাজ কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে আছেন। মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য মেয়েটির একান্ত আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ কৃপাবিষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া বলরাম-মন্দিরে লইয়া গেলেন।

মহারাজের দর্শন ও তাঁহার দিব্যবাণী শুনিয়া ভদ্রমহিলা এক অভিনব ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিল। এই ঘটনার অব্যবহিত

পরেই মহিলাটি স্বামীজীর শিষ্য ভগিনী দেবমাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। উহা পাঠ করিলেই সম্যক্‌রূপে বুঝা যাইবে যে সেই দিন অল্প সময়ের জন্য হইলেও মহারাজের দিব্য সঙ্গে সেই অধ্যাপক-দুহিতার অন্তরে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল।

'Oh sister, it was far more wonderful than I had hoped. Only five minutes he said something so wonderful to me and so encouraging and he took my hand in his two hands and something definite happened. I went out of that room feeling twenty years younger, full of hope to struggle on and with a new faith that it was all true. It was a wonderful day for me. I have felt so much more content and peaceful ever since and so full of gratitude to him and to them all for helping it to happen.'

অনুবাদ :—ও ভগিনি! আমি যা আশা করিয়াছিলাম তার চেয়েও অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য দর্শন পাইয়াছিলাম কিন্তু আমার হাতখানি তাঁহার দু'খানি হাতের মধ্যে রাখিয়া এমন আশ্চর্যজনক ও উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন যাহাতে আমার ভিতর নিশ্চিত একটা কিছু ঘটিয়াছিল।

যখন তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম, আমার তখন অনুভব হইয়াছিল যে সাধনায় পূর্ণ আশান্বিত হইয়া সত্যকারের নূতন বিশ্বাসবলে আমার বয়স যেন কুড়ি বছর কমিয়া গিয়াছে। এই দিনটি আমার কাছে অপূর্ব। সেই দিন হইতে কত তৃপ্তি আর শান্তি উপলব্ধি করিতেছি। ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ, আর যাঁহারা আমাকে এই দর্শনলাভে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকটেও আমি কৃতজ্ঞ।

* * * *

শ্রীমহারাজ মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এই বাটীর সমগ্র পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণের পরম ভক্ত। মঠের সাধুদের প্রতি তাঁহাদের সকলেরই ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল; গৃহের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মহারাজের প্রতি অশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, মহারাজও সকলকে লইয়া সর্বদা আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। মহারাজের অবস্থানকালে এই গৃহে উৎসব-তরঙ্গ বহিয়া যাইত।

বলরাম-মন্দিরের বহির্বাটীর উপরে সিঁড়ির পার্শ্বে দ্বিতলে দক্ষিণদিকে পশ্চিম পার্শ্বে যে ঘরটি রহিয়াছে তথায় মহারাজ শয়ন ও উঠা বসা করিতেন। তাঁহার শুইবার খাটটির সম্মুখে একটি ছোট খাট ছিল। ঐ ছোট খাটটিতে বসিয়া তিনি ভক্তদের সঙ্গে কখনও কখনও আলাপ আলোচনা করিতেন।

মহারাজ বলরাম-মন্দিরে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এখানে বহু ধর্মপ্রসঙ্গ করেন যাহা ধর্মজীবন-গঠনে সাধকগণের বিশেষ সহায়ক। আমরা তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম :

খুব সকাল সকাল ওঠা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে, এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি বেশ শান্ত থাকে—উহা ধ্যান জপের বিশেষ অনুকূল।

সাধনার দ্বারা মনটাকে transparent (নির্মল) করতে হয়, তা না হ'লে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। struggle, struggle (চেষ্টা, চেষ্টা)। struggle (চেষ্টা করবার প্রবৃত্তি) যার আসেনি, সে তো lifeless (মৃত)। বুক পেতে এই struggle বরণ ক'রে নিলে তার next step (পরের অবস্থা) শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন, সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে।

ভগবান কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য। তিনি কখনও সুগম পথ দিয়ে, কখনও কাঁটার মধ্য দিয়ে, কখনও দুর্গম পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

* * * *

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অনেক সময় বহু ভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপা লাভ করেন ও তাঁহার উপদেশলাভে ধন্য হন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ ভুবনেশ্বর হইতে বেলুড় মঠে

আসিলেন। কিন্তু মঠে তেমন সুস্থবোধ না করায় কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে মাঝে মাঝে থাকিতেন। এই সময় একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলরাম-মন্দিরে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। সরলচিত্ত রামলাল দাদাকে দেখিয়াই মহারাজ আনন্দে বিভোর হইলেন, ঠাকুরের সময়কার সরস ঘটনাপ্রসঙ্গ তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। মহারাজ তাঁহাকে ধরিলেন, ঢপওয়ালী সাজিয়া ঠাকুরের সময়কার গান শুনাইতে হইবে। রামলাল দাদা প্রথমে আপত্তি করিলেও মহারাজের অনুরোধ এড়ানো তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল, অগত্যা তিনি রাজী হইলেন। সন্ধ্যাবেলায় বলরামবাবুর বাড়ীর মেয়েদের বস্ত্র ও অলংকারে সুসজ্জিত হইয়া রামলাল দাদা নৃত্য ও নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে কীর্তনের সুরে মধুরকণ্ঠে মহারাজকে গান শোনাইতে লাগিলেন ঃ

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত,
(ও তোর) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা, নইলে আস্‌বি দ্রুত।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে,
(বল্‌লেও বল্‌তে পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে ॥

'আগে রাখাল ছিলে রাজা হয়েছ' এই আখর দিয়া যখন রামলাল দাদা ভাবভরে বার বার গাহিতেছিলেন তখন মহারাজের হাস্যোৎফুল্ল মুখ সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি যেন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন—

অতীতের ব্রজগোপীগণের আকুল আহ্বান বহন করিয়া আনিল যেন সেই গানের সুর! সত্যই যে তিনি রাখাল ছিলেন, রাজা হইয়াছেন। ব্রজধামের রাখাল বুঝি তাই তাঁহার স্ব-স্বরূপের আভাস পাইয়া অপার্থিব ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর একসময়ে বলিয়াছিলেন, রাখাল নিজের স্বরূপ জানিলেই দেহ ছাড়িবে। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে যাঁহারা প্রস্ফুটিত কমলের উপর নৃত্যরত রাখালরাজের প্রথম দর্শনের কথা শুনিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ থাকায় তাঁহারা কেহ কোন দিন সেই বিষয় মহারাজের নিকট প্রকাশ করেন নাই। এতদিন পরে বোধহয় রুদ্ধ প্রস্রবণের মুখ খুলিয়া গেল, নিত্যলীলার স্বরূপ-সত্তা জাগাইতে এ যেন ব্রজের অস্ফুট আহ্বান।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

একদিন গভীর রাত্রে মহারাজ দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নির্বাক্ ভাবেই অন্তর্হিত হইলেন। নিস্তব্ধ রাত্রিতে ঠাকুরের আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের বিষয় তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এমন সময় তাঁহার জনৈক সেবক ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, মহারাজ খাটের উপর উপবিষ্ট। তিনি কিছুক্ষণ পরে সেবককে চিন্তিতভাবে বলিলেন 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, তাকিয়ে দেখি ছোট খাটটির সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। কোন কথা বললেন না, কিছুই বুঝতে পারছিনে, কেন তিনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তর্হিত হলেন।' একটু

পরে প্রশান্ত-গম্ভীরস্বরে মহারাজ বলিলেন, 'এখন আমার মনে কোন বাসনা নেই। এমনকি তাঁর নাম করবারও বাসনা নেই—শুধু শরণাগত শরণাগত।'

বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ শুক্রবার শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন। সকলের পরামর্শে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইল, চিকিৎসায় বেশ ফলও হইল। মহারাজ অন্নপথ্য করিলেন। ভক্তবৃন্দের মন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ, এই সময় হঠাৎ তাঁহার বহুমূত্ররোগ বাড়িয়া গেল। এই বার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল, তার পরে কবিরাজী। মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন 'হাকিমিটা আর বাকী থাকে কেন? দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার হাস্যোৎফুল্ল ভাব ও সকৌতুক ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহাকে একদিন বলরাম-মন্দিরের দোতলার ছোট ঘর হইতে হলঘরে লইয়া যাইরার সময় তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, 'ওরে মরা হাতী লাখ টাকা।' এই কথা শুনিয়া এই দুঃসময়েও সেবকগণ হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই চিকিৎসার জন্য কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় আসিলেন। সদানন্দময় মহারাজ তাঁহার বিভূতিলিপ্ত ললাট দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কবিরাজ মহাশয় কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য—আর সব মিথ্যা।'

সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপানার কি কষ্ট হচ্ছে? তদুত্তরে মহারাজ বলিলেন

'সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্বকম্—আমার অবস্থা এখন এই রকম, তোমরা এইটি ধারণা কর।' বলিতে বলিতে রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া মহারাজ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন—এক অপার্থিব দিব্য জ্যোতিতে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

ডাক্তার কবিরাজ সকলেই মহারাজের জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। ৮ই এপ্রিল শনিবার রাত্রি ৯টার সময় হলঘরে তিনি সমবেত সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে একে একে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। সকলের মুখে হতাশার ভাব দেখিয়া বলিলেন 'ভয় পেয়ো না। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিলেন, বাবারা, যে যেখানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক্'। গুরুভ্রাতাদিগের নিকট বিদায় লইতে লইতে তাঁহার মন যেন এক অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল ; তিনি বলিলেন, 'এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, আহা! এক প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে ; আমি ব্রজের রাখাল। দে দে, আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্চিস্ নি? তোদের চোখ নেই। আহা হা, কি সুন্দর কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ—এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবারের খেলা শেষ হ'ল। দ্যাখ দ্যাখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয়।'

শ্রীশ্রীমহারাজ পরক্ষণেই মহাধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানে এই ভাবে রবিবারও কাটিয়া গেল। পরদিন সোমবার ১০ই এপ্রিল রাত্রি পৌনে নয়টার সময় সেই মহাধ্যান মহাসমাধিতে পরিণত হইল—শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখালরাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। মহারাজের মহাসমাধি-লাভের সময় পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ ও সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার নিকটে ছিলেন। পরদিন মহারাজের স্থূল ভাগবতী তনু বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে চিতাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল।

মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হ'ল, ফলে কোনটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হ'লে ভগবান লাভ তো দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও গোলমাল হবে। ভগবান লাভ করতে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক ক'রে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে নিষ্ঠার সহিত সাধন ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হ'লে, যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে।

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহার হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে 'ঈশ্বরকোটি' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন, প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ সেই বাবুরাম মহারাজ অর্থাৎ পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বলরাম-মন্দিরে বহু সময়ে অবস্থান করেন। বলরামবাবু ছিলেন তাঁহার নিকট আত্মীয়, তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত, সেইজন্য বলরাম-গৃহে তাঁহার আগমন দুর্লভ ছিল না।

বলরামবাবুর গৃহেই বাবুরাম-জননী পরমভক্তিমতী মাতঙ্গিনী-দেবীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরামকে চাহিয়া লইয়াছিলেন। 'এই ছেলেটিকে তুমি আমায় দাও, শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যাচ্ঞায় কিছুমাত্র বিচলিতা না হইয়া মাতঙ্গিনীদেবী উত্তর দেন, 'বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকবে এ তো অতি সৌভাগ্যের কথা।'

বাবুরাম মহারাজ যখন তরুণ তখনকার দিনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

বলরাম-বাটীর নীচের তলায় তখন একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। একদিন বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছিলেন। নীচের তলায় একটি বালিকা আঁচলে-বাঁধা একটি চাবির থোলো সশব্দে ঝন্ ঝন্ করিয়া ঘুরাইতেছিল। ঠাকুর বাবুরামের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দ্যাখ, মেয়েরা পুরুষদের ঐরকম ক'রে বেঁধে বন্ বন্ ক'রে ঘোরায়। তুইও কি ঐরকম ঘুরতে চাস্?'

স্ত্রীলোকের হাতে সাধারণ পুরুষ কিরূপ ক্রীড়াপুত্তলী হয়, তাহা সেদিনের দৃষ্টান্তে তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। উত্তরকালে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তরুণদিগের কামিনীর প্রতি আসক্তি ও মোহ দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিতেন।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের জননী-স্বরূপ প্রেমঘনমূর্তি প্রেমানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণও এই বলরাম-মন্দিরেই (উপরের হলঘরে) হয় (৩০শে জুলাই, বিকাল ৪টা ১৫ মিঃ, ১৯১৮ খৃঃ)।

এই সময় পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ বলরাম-মন্দিরের নীচের তলায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকের ঘরে অসুস্থ হইয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন বলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। বাবুরাম মহারাজ দেখিতে ইচ্ছা করায় তাঁহাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইলে তিনি সপ্রেমে গুরুভ্রাতার হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তুরীয়ানন্দের দর্শনে ও স্পর্শে প্রেমানন্দের মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। উভয় গুরুভ্রাতাই নির্বাক্ নিস্তব্ধ, উভয়েরই নয়নকোণে আনন্দাশ্রু! বাবুরাম মহারাজ একটু পরে অনুচ্চস্বরে বলিলেন 'কৃপা, কৃপা, কৃপা।'

এই সময় একদিন পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ সারদানন্দ মহারাজকে অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন, 'চাঁপা ফুলের মত রঙের কাপড় পরতে ইচ্ছা করে, আর বেলফুলের মত ধবধবে অন্ন খেতে ইচ্ছা করে।' হ্লাদিনী শক্তি হইতে বিচ্ছুরিত লীলাসহায়ক প্রেমানন্দের স্বরূপে লীন হইতে ইচ্ছার ইহা যেন দৈব ইঙ্গিত!

স্বামী প্রেমানন্দের মহাপ্রয়াণের কাল সমাগত বুঝিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ শোকাকুলচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বাবুরামদা, বাবুরামদা, ঠাকুরকে মনে পড়ছে তো?' ইহা শুনিয়া প্রেমানন্দ মহারাজের মুখ মধুরহাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার অন্তর বাহির জুড়িয়া বিদ্যমান! মহাবীর হনুমানের ন্যায় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে দেখা যাইত প্রেমানন্দের হৃৎপদ্মে বরাভয়-মূর্তি সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণ!

সমবেত সাধুবৃন্দের মধুর রামকৃষ্ণ-নাম-কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে রামকৃষ্ণময় স্বামী প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে লীন হইলেন। তাঁহার পবিত্র দেহ বেলুড়মঠে জাহ্নবীতটে চিতাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল।

সর্বদা তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস রেখে ঠাকুরের পূজা করবে। এরূপ করতে করতে পূজায় মন বসলেই মন স্থির হবে।

—স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দ

আজন্ম বৈদান্তিক পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলরাম-মন্দিরে একাধিক বার অবস্থান করেন। তাঁহার পূর্বাশ্রম বলরাম-ভবনের অতি সন্নিকটেই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলরাম-বাবুর বাটীতে শুভাগমন করিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনেন। তখন তুরীয়ানন্দ মহারাজ ছিলেন তরুণবয়স্ক—হরিনাথ চট্টো-পাধ্যায়। সেদিনকার ভাবোজ্জ্বল চিত্রটি যাহা পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' পরিস্ফুট করিয়াছেন আমরা তাহা এখানে তুলিয়া ধরিলাম ঃ

বলরামবাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু (হরিনাথ) ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশল প্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—"কি জান? কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা ব'লে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ ব'লে ঠিক ঠিক মনে-জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হ'লে কি হয়? তিনি কৃপা ক'রে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন ক'রে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সেই শক্তি দিয়ে সে কত-টুকু চেষ্টা করতে পারে?" এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়।" ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

"ওরে কুশীলব, করিস্ কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে?"

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুইচক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল। কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু বলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সে দিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।"

* * * *

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলরাম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত সভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন।

তাঁহার তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, বৈরাগ্যপূর্ণ প্রেরণাময়ী বাণী জ্বলন্ত চরিত্র শ্রোতৃবৃন্দের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অসুস্থ হইয়া কলিকাতা আসিয়া বলরাম-মন্দিরে নয় দশ মাস থাকিয়া চিকিৎসাদির দ্বারা স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ মহারাজ এখান হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ৺কাশীধামে গমন করেন।

ভগবানের ভজন মানে মন প্রাণ সব তাঁতে অর্পণ করা। তিনিই হবেন সকলের চেয়ে বেশী প্রাণের জিনিস। তাঁর জন্যই হবে প্রাণের ষোল আনা টান। তাঁকে পেলুম না, তাঁতে ভালবাসা হ'ল না ব'লে কাঁদতে হবে, তবেই তিনি তাঁর উপর ভালবাসা দেবেন। তাঁর কৃপা চাই, তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হবে না। কৃপা ব্যতিরেকে সাধন দ্বারা কেহ কিছুই ক'রে উঠতে পারে না। তবে আন্তরিকভাবে সাধনাদি করলে যথাসময়ে তাঁর কৃপার উদয় হয়ে থাকে। ··· সংসারে সকল জিনিসই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রভুপদে মতি গতি হওয়া দুর্লভ। তাঁতে ভক্তি হলেই জীবন মধুময় হয়ে যায়। ··· হরি বিনা গতি নাই; কারণ তিনিই একমাত্র সত্য ও নিত্য আর সব মিথ্যা, এই আছে এই নাই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

ঠাকুরের 'মিরাকেল' পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) একাদিক্রমে প্রায় নয় বৎসর কাল বলরাম-মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। এখানে তিনি অধিকাংশ সময়ে একাকী ধ্যান-তদ্গত ভাবে কাটাইতেন, কেবল সকালে ও সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ভক্তসঙ্গে নানাবিধ সদালোচনা করিতেন। আলাপ আলোচনার সময় কখনও কখনও তাঁহাকে অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার কথায় অন্তরের স্নেহপ্রীতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। অনুরক্ত ভক্ত ও সেবকদিগের উপর তাঁহার কী প্রেমপূর্ণ ব্যবহারই না ছিল! ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁহার সমান ব্যবহার অপূর্ব শিক্ষার বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিবার সময় লাটু মহারাজ আত্মহারা হইতেন। একবার বলেন: প্রথমবার বিলাত থেকে এসে একদিন সেই সাবেক বরানগর মঠের ঢঙে মোটা চাদরখানা গায়ে দিয়ে স্বামীজী এই বলরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, 'ভাই লাটু! আমি সেই নরেন, তুইও যেমন ভিখারী, আমিও সেই রকম ভিখারী সন্ন্যাসী, গুরুভাইদের থাকবার জন্যে মঠ স্থাপন করতে হ'ল, আমার কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই এত বড় ব্যাপার হ'য়ে গেল। আজ তোর কাছেই ভিক্ষা করা যাক, আয় তুজনে এক সঙ্গে খাই।' আমি তখন খেতে যাচ্ছিলাম, স্বামীজীও আমার সঙ্গে একপাতে

খেতে বসে গেলেন, তাতে আমার মনে কোন ভিন্ন ভাব হয়নি, বরং আমার প্রাণ আনন্দে ভ'রে উঠল।

বলরাম-মন্দিরের নীচের তলার পূর্ব-দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে লাটু মহারাজ থাকিতেন। সেখানে ঠাকুরের প্রাচীন ও নবীন ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার উপদেশ লাভ করিতে আসিতেন। একদিন এক যুবক ভক্ত জানাইলেন, সে চাকরি ছাড়িয়া ধ্যানভজন-তীর্থভ্রমণে কাটাইবে। লাটু মহারাজ শুনিয়া ভৎ´সনা সহকারে বলিলেন, 'ভবঘুরের জীবন ভাল নয়, ভগবানের উপর তোমার যে টান তা তো আমি দেখতে পাচ্ছি, কতক্ষণ ধ্যান কর? দেখি, নানা জায়গায় আড্ডা দিয়ে কাটাও, তার চেয়ে চাকরি না ছেড়ে বুড়ো বাপমায়ের সেবা কর, ঠাকুর বলতেন, বাপ-মা প্রত্যক্ষ ভগবান।'

যাহাকে যেরূপ উপদেশ দিলে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে সত্যদ্রষ্টা লাটু মহারাজ তাহাকে সেইরূপ উপদেশই দিতেন। তাঁহার নিকট পথনির্দেশ পাইয়া বহুলোকের জীবনের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি-বলে স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মানুষের মন বুঝিতে পারিতেন এবং অতি অল্প কথায় সকল দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের নিরসন করিয়া দিতেন।

স্বর্গত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্বন্ধে লাটু মহারাজের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি প্রায়ই গিরিশবাবুর সংবাদ আনিবার জন্য ভক্তদিগকে পাঠাইতেন। গিরিশবাবুও লাটু মহারাজের কুশলাদি জানিতে ও তাঁহাকে দর্শন করিতে বলরাম-মন্দিরে প্রায়ই আসিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি লাটু মহারাজের অপার ভক্তি ও নির্ভরতা ছিল। নিজের অন্তর্নিহিত ভাবটি একদিন হঠাৎ প্রকাশ করিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—'মাকে মানা কি সহজ কথা রে? মা যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুত তপস্যার দরকার।'

১৯০৯ খৃঃ ২৮ শে ডিসেম্বর পূজ্যপাদ অদ্বৈতানন্দজীর দেহত্যাগের সংবাদ যখন বলরাম-মন্দিরে আসিল তখন হইতে সারা-দিন লাটু মহারাজ কেবল বুড়ো গোপাল দাদার (স্বামী অদ্বৈতানন্দজী) কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, "বুড়ো গোপাল দাদা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের উপর তরকারি জুটতো না। সেই তো মঠে সবজি-বাগান লাগিয়ে দিল। সবজি-বাগান করতে তাঁকে কত খাটতে হয়েছে।...তাঁর মতন ধীরভাবে জপে লেগে থাকতে ক'জন পারে? অনেকেই তো দু-চার দিন জপ ক'রে ফল না পেলে জপ ছেড়ে দেয়, গোপাল দাদা বুড়ো বয়স পর্যন্ত ধৈর্য ধ'রে জপে লেগেছিল; তাঁর ধৈর্যের তুলনা নেই। রাখাল ভাই তো সেই কথাই বলে।"

পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে লাটু-মহারাজ ভাবের আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন, একদিন বলিয়াছিলেন, 'শশী মহারাজের সেবা করলেই ঠাকুরের সেবা করা হ'ল।' ১৯১১ খৃঃ ২১ আগষ্ট পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ-লোকে চলিয়া গেলেন, তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর লাটু মহারাজ ৺কাশীবাসের সঙ্কল্প করিলেন কিন্তু গিরিশবাবুর অনুরোধে তখন

কলিকাতাতেই থাকিতে হইল, কাশী যাওয়া সম্ভব হইল না। গিরিশবাবুর দেহরক্ষার পর তিনি বলরাম-মন্দির ত্যাগ করেন।

গিরিশবাবুর অসুস্থতার সময় ডাকাইয়া পাঠাইলেও লাটু মহারাজ গিরিশবাবুকে দেখিতে যাইতেন না। বলিতেন, গিরিশের কষ্ট আমি দেখিতে পারি না। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার এমনি ভালবাসা ছিল। গিরিশবাবুকে দেখিতে না গেলেও প্রত্যহ দুইবার করিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। যে দিন গিরিশবাবুর দেহত্যাগ হয় (২৫ শে মাঘ, ১৩১৮) সেদিন লাটু মহারাজ কাহারও সহিত কথা বলেন নাই, পরদিন কেবল গিরিশবাবুর প্রসঙ্গই করেন।

১৯১২ খৃঃ এপ্রিল মাসে রামকৃষ্ণ বসুর একমাত্র পুত্র ঋষির সহসা কলেরারোগে অকালে মাত্র ১১বৎসর বয়সে জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ছেলেটির অসুখের সংবাদ কেহই লাটু মহারাজকে দেয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ছেলেটার এত অসুখ, আমায় একবার কেউ জানালে না। চোখের সামনে দিয়ে জ্বলজ্যান্ত ছেলেটা চ'লে গেল, কিছুই করতে পারলুম না।'

ইহার ছয়মাস পরে শ্রীশ্রী৺বিজয়া দশমীর দিন (১৯১২ খৃঃ অক্টোবর মাসে) পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ বলরাম-মন্দির হইতে চিরবিদায় লইয়া বিশ্বনাথক্ষেত্রে ৺কাশীধামে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি গৃহের দিকে তাকাইয়া তিন বার 'মায়া, মায়া, মায়া !' উচ্চারণ করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করিয়াছিলেন।

* * * *

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ বলরাম-ভবনে বাস ও আহারাদি করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দ মহারাজ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ দীর্ঘকাল এখানে ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বলরাম বসু মহাশয়কে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

ভগবানের উপর নির্ভর করতে না পারলে শান্তি পাওয়া যায় না। কত সাধুসঙ্গ ধ্যানজপ করলে তবে নির্ভরতা আসে।

পবিত্র হও, পবিত্র হও। ভক্তের সংযম বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ এবং জপধ্যানেও সংযম আসে।...ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা করবে তাতেই অহং নাশ হবে।...দেবসেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার হয়।...তাঁর কৃপা হয় কার উপর? যে তাঁর কৃপা পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে—তাঁর জন্য যার অন্তর ছট্‌ফট্‌ করে তারই উপর।

—স্বামী অদ্ভুতানন্দ

স্মৃতিকথা *

বাংলা ১৩০৩ সালে বৈশাখ মাসে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন বরকনে যখন নাবে তখন শ্রীশ্রীমা বাড়ীর অপর সকলের সহিত নিচে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমরা উপরে আসিয়া ঘরে বসিলে মা প্রথমে আমায় টাকা দিয়া আশীর্বাদ করেন; পরে গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে আশীর্বাদ করেন।

শুনিয়াছিলাম আমার বিবাহের পূর্বে শ্রীশ্রীমা এই বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন, বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের খুব ভিড় হওয়ায় পাশের বাড়ীতে অর্থাৎ শরচ্চন্দ্র সরকারের বাড়ীতে চলিয়া যান এবং পিছনের দরজা দিয়া যাতায়াত করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষা হয়। মা তখন গঙ্গার ধারে সরকারদের গলির মধ্যে একটি বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে স্বামী যোগানন্দ মহারাজও থাকিতেন।

আমি শ্রীশ্রীমাকে অনেক বার এবাটীতে আসিতে ও থাকিতে দেখিয়াছি, তবে সাল বা তারিখ সম্বন্ধে কিছু মনে নাই। আমি যে ঘরে শুই, এখানে থাকিবার সময় মা সেই ঘরে বেশীর ভাগ থাকিতেন, কখনও কখনও উত্তর-পশ্চিমের লম্বা ঘরে থাকিতেন। বাহিরের ভক্তেরা আসিলে মা তাঁর অভ্যাসমত ঘোমটা দিয়া থাকিতেন, ভক্তেরা একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। মায়ের কাছে সে সময় প্রায়ই গোলাপ-মা এবাটীতে থাকিতেন,

* ভক্ত বলরাম বসুর পুত্রবধূ কর্তৃক পরিবেশিত

অনেক সময় গৌরী-মাও ছিলেন। যোগীন-মা খুবই আসিতেন তবে রাত্রি যাপন করিতেন না। ঠাকুরঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মা পূজা ও জপধ্যান করিতেন। এখানে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা নিজেই ঠাকুরের ভোগ দিতেন। ভোগের পর ঠাকুর-ঘরের পাশের দালানে বসিয়া সকলে প্রসাদ পাইতেন। এই সময়ে আমরা মায়ের শ্রীমুখ হইতে ঠাকুরের কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

উদ্বোধনের বাড়ী হওয়ার পর মা সেইখানেই স্থায়িভাবে বাস করিতেন। কখনও কখনও গঙ্গাস্নান করিয়া ঠিকা-গাড়ী করিয়া এখানে আসিতেন ও কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। এ বাড়ীতে কাহারও অসুখবিসুখ করিলে তিনি সব সময়েই খবর লইতেন এবং মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিজের বাড়ী (উদ্বোধন-কার্যালয়) হওয়ার পর আমার শাশুড়ীরা রোজই সন্ধ্যার সময় উদ্বোধনে গিয়া মায়ের নিকট অনেকক্ষণ কাটাইতেন, আমিও অনেক দিন তাঁহাদের সঙ্গে যাইতাম।

শ্রীশ্রীমায়ের এ বাড়ীতে থাকাকালে গিরিশবাবু একবার দুর্গা-পূজা করেন। গিরিশবাবুর বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিবার জন্য মা আমাদের পিছনের দরজা দিয়া যাতায়াত করিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরাম-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য ও গৃহী ভক্তগণের পূত সংস্পর্শে বলরাম-মন্দির মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তানদের মধ্যে রাজা মহারাজকে বহুদিন এ বাড়ীতে আসিতে ও থাকিতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি ঠাকুরের সময় হইতেই তিনি এ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে তাঁহাকে বিশেষ যত্ন আত্তি করিতেন। রাজা মহারাজের আগমনে বলরাম-মন্দির সর্বদা আনন্দে মুখরিত থাকিত। সেই বিমল আনন্দ আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমার ছেলেমেয়েরা, বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম-বাবুর ছেলেমেয়েরা এবং আমাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহার অযাচিত স্নেহ ও করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তিনি যখন এখানে থাকিতেন তখন দিনের বেলা অন্দরমহলে আসিয়া আহার করিতেন। আমরা চারি পাশে বসিয়া তাঁহার খাওয়া দেখিতাম। তিনি তখন অনেক ভাল ভাল কথা বলিতেন এবং হাসির গল্প করিয়া আনন্দে সকলকে ভরপুর করিয়া রাখিতেন। রাত্রে বাহিরের ঘরে অর্থাৎ যেখানে ঠাকুরের ঘর সেখানে থাকিতেন, সেখানেই রাত্রের খাবার দেওয়া হইত।

শ্রীশ্রীমহারাজ যখন এখানে থাকিতেন তখন এই বাড়ীতে যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া থাকিত। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত ভজন কীর্তন পাঠ ও সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া শত শত সাধুভক্তের প্রাণে বিমল আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত। এখানে 'বসিয়া

এই আনন্দ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের দেহত্যাগের ২।৩ দিন পূর্বেও বাহিরের হলঘরে আমাকে ডাকাইয়া এবং কাছে বসাইয়া অনেক সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন মঠের সাধুদের ছাড়া অন্য কোন ভক্তকে মহারাজের কাছে যাইতে দেওয়া হইত না। মহা-রাজের স্নেহাশীর্বাদের কথা সর্বদাই আমার মনে হয়।

আমাদের আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই ঠাকুরের সন্তানদের অপার স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহারাজরা দীর্ঘকাল এ বাড়ীতে থাকায় আমরা এখানে বসিয়াই তাঁহাদের কত ভজন কীর্তন ও সদুপদেশ শোনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তখন মনে হইত যেন আনন্দধামেই সর্বদা বাস করিতেছি। আজ বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

—প্রাপ্তিস্থান—

বলরাম-মন্দির

৫৭, রামকান্ত বোস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৩

ও

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩